প্রথম বর্ষ ॥ সপ্তম সংখ্যা ॥ কার্তিক ॥ ১৩৮২

আনন্দমেলা

উৎসবের দিনে ছেলেমেয়েদের সঙ্গী

বিনী প্রিন্টস্

সাজগোজের বাহার ছেলেমেয়েদের জন্যেই। রঙবেরঙের চমকদার জামাকাপড় পরে দৌড়ঝাঁপ করার এই তো বয়স। আর সেই জন্যেই বিনী প্রিন্টস্-এর কদর এত বেশি। লোকের চোখে পড়ার মতো, মনে ধরার মতো বাহারী নকশার জন্যেই বিনীর

এতো নামডাক। বিয়ে বাড়িই বলুন বা অন্য কোন উৎসবই বলুন— ছেলেমেয়েদের জমজমাট সাজগোজের জন্যে বিনী প্রিন্টস্ না হলেই নয়।

বিনী

ছেলেমেয়েদের মনের মতো
সূতী কাপড়

BCCM-43-75 BEN

আনন্দমেলা

প্রথম বর্ষ ॥ সপ্তম সংখ্যা
কার্ত্তিক ॥ ১৩৮২
দেড় টাকা

ছড়া
দিব্যেন্দু পালিত ৪

উপন্যাস
কাপালিকরা এখনও আছে/বিমল কর ১৮
রাজা হওয়ার ঝকমারি/বিমল মিত্র ২৮

গল্প
বিড়ালের চোখ/নীহাররঞ্জন গুপ্ত ১২
সব ঘোড়াই কথা বলে/বরেন গঙ্গোপাধ্যায় ২৪
টুপির কারচুপি/সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ৩৩

রূপকথা, ইতিহাস
বিক্রমাদিত্যের গল্প/প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত ৮
বিষাণধারী রোল্যাণ্ড/উমা দাশগুপ্ত ৪৮

জীবজন্তুর কথা
বানরেরা মানুষ হচ্ছে/মিনতি রায় ৩৬

খেলাধুলো
ফুটবলের রঙ্গরাজ থঙ্গরাজ/স্ট্রাইকার ৪১
বেসবলের দেশে ফুটবলের রাজা ৪৪
বাপ কা বেটা ৪৫

নিয়মিত বিভাগ
ধাঁধা ৫, আচ্ছা বলো তো ৫
বিন্দুবিসর্গ/ইন্দ্রমিত্র ১৭
অঙ্কের মজা, মজার অঙ্ক ৩২
ম্যাজিকের মতো ৩৮
রাজায় রাজায় ৩৯
ম্যাজিক/পি সি সরকার, জুনিয়ার ৪০
আজব চিড়িয়াখানা/বহুরূপী ৫২
তোমাদের পাতা ৫৩
জাদুঘর/শ্রীপান্থ ৫৪

সম্পাদক ॥ অশোককুমার সরকার

আনন্দবাজার পত্রিকা
লিমিটেড-এর পক্ষে অক্ষয়কুমার
চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার
স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০০১ থেকে
প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট
লিমিটেড, পি ২৪৮ সি. আই. টি. রোড,
কলিকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।

বিমান মাশুল : ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

ছড়া/দিব্যেন্দু পালিত

হাওয়ার ছড়া

'যাই' বললেই যাওয়া হয় না,
'খাই' বললেই খাওয়া—
'পাই' বললেই পাওয়া হয় না,
'চাই' বললেই চাওয়া।
তবুও আছে বাকি—
সেই কথাটির আড়াল খুঁজে
শাক দিয়ে মাছ ঢাকি।
এবার বলো তো কি?
—হাঁ করলেই মুখের মধ্যে
উপছে পড়ে হাওয়া।

নকুড় দস্তিদার

নকুড় দস্তিদার
জবর কোষ্ঠী তার—
হবে নাকি রাজা একদিন।
হলোও সে ঠিক তাই—
দেউলে আপ-টু পাই
টপ-টু-বটম শুধু ঋণ।

গলা সাধা

এক ছিল আমাদের সুরকার সরকার—
রোজ প্রত্যুষে তার গলা সাধা দরকার।
পাড়া-পড়শীর ঘুম ভাঙে সেই আওয়াজে—
'এ-রকম গাধা আর দুর্লভ পাওয়া যে!'
সরকার গ'লে গিয়ে বলে, 'সবই দয়া তাঁর'!

ধন্যি মেয়ে

বাবার ছিল জুড়ি গাড়ি, ছেলের ছিল টৌরি—
শখ ক'রে মেয়ের নাম রেখেছে
দ্য গ্রেট কুইন্ মেরী।
সেই মেয়েরই বিয়ে—
বর আসছে ব্রাজিল থেকে
স্পেশাল লিভ নিয়ে।
তত্ত্ব দেখে মেয়ে বলল,
নেই কেন স্ট্রবেরি!

ছবি এঁকেছেন ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী

ধাঁধার পাতা

পুজোর ছুটিতে ছোট্‌কা কলকাতায় থাকে না কোনও বছর। হিল্লিদিল্লি করে বেড়ায়। পুজোর কটা দিন আমারও একদম সময় থাকে না। অথচ তোমাদের নতুন ধাঁধা চাই। ছোট্‌কাকে পই-পই করে বলে দিয়েছিলাম, যেখানেই যাও, ধাঁধা পাঠাতে ভুলো না। তা কি আর ছোট্‌কার মনে আছে!

ছোট্‌কারা পুজোর এক সপ্তাহ আগে বেড়াতে বেরিয়েছে। আজ মহাষ্টমী। এখনো কোনো চিঠি আসার নাম নেই। কী করি, অগত্যা কাগজ-কলম নিয়ে বসলাম। ধাঁধা বানাতে হবে। নিজেই বানাব এবার। কিন্তু কী নিয়ে যে বানাব তাই তো ছাই খেলছে না মাথায়।

কাগজের পর কাগজ মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, কলম খুলছি আর বন্ধ করছি। ধাঁধার দেখা নেই। এমন সময় হঠাৎ পিড়িং করে কী যেন একটা লাফিয়ে উঠল মাথায়। পেয়েছি! খসখস করে লিখে ফেললাম দুটো লাইন :

ড্যামকুড়কুড় বাজে ড্যামকুড়কুড়—
এই বাজনায় লাগে পুজো-পুজো সুর।

নিজের কৃতিত্বে নিজেই অবাক। কোন্ বাজনা বলো তো? খুব শক্ত হয়ে গেল না তো? বেশ আরও দু-লাইন যোগ করে দিচ্ছি :

নামের পিছনে যোগ করলে আকার
পাত্র তৈরী হবে লুকিয়ে-রাখার।

ছন্দ-টন্দ থাকলো কি-না কে জানে! এ তো সবে **প্রথম ধাঁধা**। পাক্কা দু-ঘণ্টা লাগল চার লাইন লিখতে। যাক গে, কাল দেখা যাবে।...

ভাগ্য ভালো বলতে হবে। নবমীর দিন সকালের ডাকেই ছোট্‌কার চিঠি এসে হাজির। সঙ্গে একগুচ্ছ ধাঁধা। তা থেকে কয়েকটা তুলে দিচ্ছি :

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ কোন্ ঘড়ি ঠিক-ঠিক সময় দেখায় দিনের মধ্যে মাত্র দু-বার অথচ বাকী দিনে-রাতে একবারও ঠিক সময় দেখায় না?

তৃতীয় ধাঁধা ॥

মৎস্যের মধ্যে সে নামী,
পেটিট্‌কু সব থেকে দামী,
মুড়ো-লেজা ওড়ে আকাশে,
মাথা বাদে গভীরতা সে।

চতুর্থ ধাঁধা ॥ উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে শূন্য স্থান পূর্ণ করো :

হুমায়ুন বাবরের ছেলে, বাবর হুমায়ুনের বাবার—।

গতবারের ধাঁধার উত্তর ॥ প্রথম ধাঁধা : ভোলাবাবু নানান ধরনের ভুল করেছেন। ভুল শব্দ ব্যবহার করেন, ইংরেজী-বাংলা মেশান, বানান ভুলও রয়েছে। যেমন, অ্যাপেনডিক্‌স অপারেশন হয় (অ্যাপেনডিসাইটিস রোগের নাম), ব্লাডপ্রেশার তো সকলেরই আছে, স্বাভাবিকের থেকে কম না বেশী তাই দেখা হয়। ভায়া লিখলে 'হয়ে' চলে না। আপ টু-র পর 'অবধি' অচল। শ্যামবাজারে পাঁচ-মাথার মোড় (চৌমাথা নয়) ; জাম্প হবে না, জ্যাম হবে। 'ইন কেস' মানেই যদি, দুটো পাশাপাশি লেখা যায় না। বিধান স্মরণী নয়, সরণী। স্টপেজ হবে না, হবে স্টপ। একজন ভদ্রমহিলাকে 'লেডিজ' বলা ভুল, একবচনে লেডি হবার কথা। কিন্তু বাংলা ভাষায় এত ইংরেজী ব্যবহার করাটাই মস্ত বড় ভুল।

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ লামা, ওলটালে মালা

তৃতীয় ধাঁধা ॥ $৯\frac{৯৯}{৯৯}=১০০$ (অন্য উত্তরও হয়)

চতুর্থ ধাঁধা ॥ ৮০২ পৃষ্ঠা। (রচনাবলী তাকে পরপর যে-ভাবে সাজানো থাকে তাতে প্রথম খণ্ডের ৯৯ পৃষ্ঠা ও শেষ খণ্ডের ৯৯ পৃষ্ঠা পোকা কাটছে না)।

সত্যসন্ধ

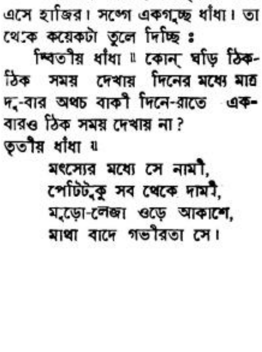

প্রঃ ওয়ার্ল্ড কাপ কার কাছে আছে?
উঃ ওয়ার্ল্ড প্লেটের কাছে।

প্রঃ পাম্প কি লোকসভার সদস্য হতে পারে?
উঃ নিশ্চয়ই পারে—শেষকালে যখন এম পি।

প্রঃ কলকাতার কোন অংশ পাকিস্তানে?
উঃ 'ক'

প্রঃ নদী কখন খারাপ ছেলে হয়?
উঃ যখন বয়ে যায়।

প্রঃ কটা বই পুরলে খালি ইস্কুলের ব্যাগ ভর্তি হবে?
উঃ একটাই—কারণ তারপরে ব্যাগ আর খালি থাকছে না।

প্রঃ বুদ্ধির দিকে বন্দুক ছুঁড়লে কী হয়?
উঃ আক্কেল গুড়ুম হয়।

প্রঃ ক্লাসে এত ধোঁয়া কিসের জন্যে?
উঃ স্যার রেগে আগুন হয়েছেন বলে।

প্রঃ বক্তৃতার শেষে সবাই ছুটে পালাচ্ছে কেন?
উঃ সভা ভাঙলো কিনা, তাই।

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
কোরক, ওকে মেরে ফ্যালো! আর যেন উঠে দাঁড়াতে না পারে!
মেরো না...ওকে মেরো না! ও তোমাকে মুক্তি দেবে!
এই বর্ম থেকে ওকে বার করে আনা দরকার!
পিস্তলে আবার কার্তুজ পুরে নাও, বার্নি!
না না, হুনলাকাকে মেরো না!
বেশ, মারব না... কিন্তু ওকে মুখোশ খুলে ফেলতে বলো। নয়তো ওর ঘাড় মটকে দেব!
এক্ষুনি গুলি কোরো না বার্নি... কে জানে, ওকে বাঁচিয়ে রাখতে পারলেই হয়তো আমাদের সুবিধে হবে!
ম্যাল পেনা! চোন্ লাটি!
অস্ট্!
আরে, বুড়োটা তো মহা ধোঁকা দিয়েছিল!
তাই তো!
স্টন্ট্!
হুনলাকার উপরে হামলা করছে ওরা!
মেঝে থেকে মস্ত তলোয়ার কুড়িয়ে বর্শার আক্রমণ ঠেকিয়ে দিল কোরক!
এসো, তোমরা হুনলাকার ঘরে চলে এসো!

শিগগির এদিকে এসো !
তার আগে এদের হটিয়ে দেওয়া দরকার !
যাক্ !
যোদ্ধা-মেয়েরা হুনলাকার উপরে এত খাপ্পা কেন ?
হুনলাকা হেরে গেছে !
তুমি যদি হারতে, তবে তোমার উপরেই ওরা খাপ্পা হয়ে উঠত।
কিন্তু... কিন্তু হুনলাকাকে তুমি মেরে ফেলো না।
এইটুকু একটা লোক অত বড় বর্ম পরে চলাফেরা করত কীভাবে?
আরে, এই বর্মের মধ্যে ইলেকট্রনিকের যন্ত্রপাতি রয়েছে দেখছি ! এ-সব জিনিস এখানে কোত্থেকে এল ?
এই বর্ম কোত্থেকে এল লিকি-বুড়ী ? এই জায়গাটারই বা নাম কী ?
জানি না। অনেক-অনেক বছর আগে আমি আর হুনলাকা এই বাড়িটার খোঁজ পাই... একটা ঘরের দেওয়ালে ওই বর্ম ঝুলছিল !
দেওয়ালের ছবিগুলি দ্যাখো...
বুঝতে পেরেছি। ওপর বলে যে লুপ্ত-শহরটা বাবা খুঁজে পেয়েছিল, সেখানেও ছিল এইরকমের ছবি।
লুপ্ত আটলানটিস মহাদেশেরই অন্য-একটা শহর এটা, বাইরের মানুষ যার কোনও খোঁজ রাখে না...

এর পর দশের পাতায়

বিক্রমাদিত্যের গল্প

প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

বিক্রমাদিত্য যে প্রাচীন ভারতবর্ষের একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন, একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু ঠিক কোন সময়ে তিনি রাজত্ব করেছিলেন, এ-বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যেও অনেক মতভেদ আছে। কেউ কেউ বলেন, বিন্ধ্য পাহাড়ের কাছে নর্মদা নদীর পাশে উজ্জয়িনী শহরে বিক্রমাদিত্যর রাজধানী ছিল, খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে তিনি রাজত্ব করেছিলেন এবং তাঁর রাজ্যসীমা কাবুল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কারো কারো মতে, বিক্রমাদিত্য হলেন গুপ্ত সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত, যিনি ৩৭৫ খৃষ্টাব্দ থেকে ৪১৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত মগধে রাজত্ব করেছিলেন। এই দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বা বিক্রমাদিত্যর সভাতেই ছিলেন সেই বিখ্যাত নজন গুণী, যাঁদের 'নবরত্ন' বলা হয়ে থাকে। এই নজন 'রত্ন' হলেন কালিদাস, বররুচি, বরাহমিহির, শঙ্কু, বেতালভট্ট, ঘটকর্পর, ক্ষপণক, অমরসিংহ, এবং ধন্বন্তরী। বিক্রমাদিত্য যিনিই হোন না কেন, ইতিহাস, কল্পনা, কিংবদন্তী সব কিছু মিলেমিশে তাঁর এমন এক চরিত্র তৈরী হয়ে গেছে যে তিনি চিরদিন আমাদের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। যে বিক্রমাদিত্যর কথা এখানে লিখছি, তিনি সেই কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য।

বিক্রমাদিত্য যেমন বিখ্যাত, তেমনই বিখ্যাত তাঁর 'সিংহাসন'। এই সিংহাসনের পেছনেও অনেক আশ্চর্য আশ্চর্য গল্প আছে। বিক্রমাদিত্য সম্পর্কে আমরা এখন যা জানি, তার অনেকটাই পাওয়া যায় ভোজরাজার ইতিহাসে। এই ভোজরাজার ইতিহাস থেকেই আমরা বিক্রমাদিত্যর সিংহাসনের কথা বিশেষ করে জানতে পাই। এরকম কিংবদন্তী আছে যে, বিক্রমাদিত্য তাঁর সিংহাসনটি উপহার পেয়েছিলেন স্বয়ং ইন্দ্রের কাছ থেকে। যখন বিক্রমাদিত্য বৃদ্ধ হলেন, এবং বুঝলেন যে তিনি আর বেশিদিন বাঁচবেন না, তখন তিনি চারদিকে তাকিয়ে দেখলেন যে তাঁর সিংহাসনে বসবার মতো উপযুক্ত কোনো লোক নেই। অবশেষে তিনি সিংহাসনটি মাটির নীচে পুঁতে রাখলেন। অনেক বছর পরে, রাজা ভোজ মৃগয়া করতে করতে সেই জায়গায় এসে উপস্থিত হলেন। তখন সেখানে বাস করে এক গরীব বামুন। ঠিক যে জায়গাটায়

সিংহাসনটা পুঁতে রাখা হয়েছিল, তার ওপরেই একটা বাঁশের মাচা খাটিয়ে বামুন বসেছিলেন তখন। ভোজরাজা এবং তাঁর সঙ্গীদের দেখে তিনি সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। কিছু পরে তিনি মাচা থেকে নেমে আসতেই তাঁর ভোল কিন্তু পাল্টে গেলো। তখন তিনি রাজার দলবলকে কঠোর ভাষায় গালাগাল দিতে শুরু করলেন। সে এক আশ্চর্য কান্ড! তখন রাজার সন্দেহ হলো যে, যে-জায়গায় মাচাটা উঠেছে, সে-জায়গার জমির নিশ্চয়ই কোনো মাহাত্ম্য আছে, যার ফলে মাচায় বসলে বামুনের মুখে ভালো কথা বেরোয়, আর মাচা থেকে নামলেই অন্য মূর্তি। তখন তিনি তাঁর লোকদের সেই জমিটা খুঁড়তে আদেশ করলেন, এবং কিছু পরেই বেরিয়ে এল রত্নখচিত বিক্রমাদিত্যের সিংহাসন। এই সিংহাসনে ওঠবার জন্যে ছিলো বত্রিশটি ধাপ বা সিঁড়ি, এবং প্রতিটি ধাপে ছিল একটি করে মূর্তি। আগেই লিখেছি যে, বিক্রমাদিত্য সিংহাসনটি পেয়েছিলেন ইন্দ্রের কাছ থেকে, কিন্তু এই সিংহাসন লাভের পেছনেও একটা ছোট্ট গল্প আছে।

বিক্রমাদিত্য যখন তাঁর দেশে রাজত্ব করছিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র একদিন তাঁকে ডেকে পাঠালেন। উর্বশী আর রম্ভা, এই দুজনের মধ্যে কে বেশি ভালো নর্তকী, তার বিচার বিক্রমাদিত্যকে করে দিতে হবে। বিক্রমাদিত্য তখন ওদের দুজনের জন্য দুটো ফুলের তোড়া আনলেন, এবং নর্তকীদের না জানিয়ে ফুলের মধ্যে লুকিয়ে রাখলেন একটি করে বিছে। উর্বশী খুব আলগাভাবে ফুলের তোড়া হাতে নিয়ে স্বাভাবিক তালে নৃত্য শুরু করলেন, এবং বিছে তাঁকে কামড়াল না। রম্ভা খুব জোরে ফুলের তোড়া আঁকড়ে ধরলেন, এবং তাঁকে বিছে কামড়াল বলে তিনি বারবার তালভঙ্গ করলেন। তখন বিক্রমাদিত্য ইন্দ্রকে জানালেন যে উর্বশীই অনেক বেশি স্বাভাবিক, এবং কুশলী নর্তকী। ইন্দ্র খুব খুশি হলেন, এবং বিক্রমাদিত্যকে একটি সিংহাসন উপহার দিয়ে দিলেন।

যাই হোক, ভোজরাজ যখন এই সিংহাসনে উঠতে যাবেন, তখন সিঁড়ির ধাপের মূর্তিরা তাঁকে বাধা দিল। তারা বলল যে ভোজরাজ বিক্রমাদিত্যর মতো গুণী নন, সুতরাং তিনি এই সিংহাসনে বসতে পারেন না। ভোজরাজ তখন কৌতূহলী হয়ে রাজা বিক্রমের গুণাবলী সম্পর্কে জানতে চাইলেন। প্রতিটি মূর্তি তখন একটি করে গল্প শোনালো ভোজরাজকে, আর এই গল্পগুলিই 'বিক্রমাদিত্যর গল্প' বলে প্রসিদ্ধ। এই গল্পগুলি থেকে একটি গল্প তোমাদের আজ শোনাচ্ছি :

বিক্রমাদিত্যর রাজত্বে সবাই সুখে দিন কাটাত। একদিন এক ব্রাহ্মণ কাঁদতে কাঁদতে এসে বিক্রমাদিত্যকে বলল যে, তার ছেলেটি জলে স্নান করছিল, এমন সময়ে এক বিশাল মাছ এসে তাকে গিলে ফেলেছে। এই কথা শুনে বিক্রমাদিত্য নদীর ধারে সেই জায়গাটিতে গেলেন। কিছু পরে, সেই অতিকায় মাছটি এসে স্বয়ং বিক্রমাদিত্যকে খেয়ে ফেলল। রাজা কোনো বাধা দিলেন না। মাছের পেটে গিয়ে দেখেন, কোথায় মাছ, কোথায় নদী, চারদিকে ঝলমল করছে এক নতুন পৃথিবী। একটা রাস্তার মোড়ে কয়েকজন ছেলে মিলে খেলাধুলো করছে, তাদের একজনকে সেই বামুনের ছেলে বলে মনে হল। কাছে গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করতেই বুঝলেন যে তাঁর অনুমান ঠিক। তখন তিনি ছেলেটিকে নিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। কিছু দূরে গিয়ে দেখেন, রাস্তায় খুব হৈচৈ আর উত্তেজনা। বিক্রমাদিত্য জানতে পারলেন যে, সেদিন সন্ধ্যেবেলাতেই এই নতুন রাজ্যের রাজকুমারী স্বয়ংম্বরা হবেন—তাই নানা দেশ থেকে রাজা, আর রাজকুমারেরা সব এসেছেন। বিক্রমাদিত্য ভাবলেন, বামুনের ছেলেটিকে তো পাওয়াই গিয়েছে, সেই সঙ্গে রাজকন্যাটিকেও যদি বিয়ে করে তাঁর দেশে নিয়ে যাওয়া যায় তাহলেই বা মন্দ কী। তখন তিনি তাঁর ইষ্টদেবীর কাছে প্রার্থনা করতে বসলেন। কিছু পরে দেখলেন, তাঁর সামনে একটা বিশাল চাদর পাতা হয়ে গেছে, এবং তার ওপরে থরে থরে সাজানো আছে মহার্ঘ সব মণিমুক্তা। বিক্রমাদিত্য তখন ব্যবসায়ী সেজে সেই সব মণিমুক্তা বেচতে শুরু করলেন। যে সব রাজারাজড়ারা রাজকন্যার স্বয়ংবরের জন্যে এসেছিলেন, তাঁরা তখন সব কিছু ভুলে বিক্রমাদিত্যর মণিমুক্তা কিনতে এলেন। এদিকে সন্ধ্যে তখন শেষ হয় হয়, সেই দেশের রাজা তখন ব্যস্ত হয়ে অন্যান্য রাজাদের খোঁজ নিলেন। যখন দেখলেন, তাঁরা সবাই নতুন ব্যবসায়ীর দোকানে আটকা পড়ে আছে, তখন বিক্রমাদিত্য সমেত এদের সবাইকে স্বয়ংবর সভায় আসতে বললেন। রাজকন্যা বিক্রমাদিত্যর রূপ দেখে ও'র গলাতেই মালা দিলেন। তখন সভা জুড়ে তুমুল হৈচৈ! এত রাজা, রাজকুমার থাকতে শেষে কিনা এক ব্যবসায়ীকে মাল্যদান। তখন বিক্রমাদিত্য তাঁর আত্মপরিচয় দিলেন। কয়েকদিন পরে, রাজকন্যা আর বামুনের ছেলেটিকে নিয়ে, সেই বিশাল মাছের পেটের থেকে বেরিয়ে নদীর ওপারে তাঁর নিজের দেশে ফিরে এলেন।

ছবি এঁকেছেন ॥ শৈবাল ঘোষ

দ্যাখো লিনডা
বর্মটা কীভাবে
ব্যবহার করতে হয়
এই নকশায় তার
হদিশ রয়েছে।
এই দুর্গ, ওই বর্ম,
এ-সবই হাজার-হাজার বছর
আগেকার লুপ্ত আটলানটিস
মহাদেশের সেই মানুষদের
তৈরী, বিজ্ঞানে যারা দারুণ
এগিয়ে গিয়েছিল।
বাবার ধারণা,
এ-সব শহরের
সন্ধান পেলে এখানে
বাইরের লোকেরা
এসে ভিড় করবে,
ফলে অরণ্যের
শান্তি আর বজায়
থাকবে না!
কোরক, বর্ম ব্যবহারের কায়দা শিখে গেছি!
জানো, সূর্যকিরণ একে ক্রিয়াশীল
করে তোলে!
বার্নি একটা ফ্যাসাদ
বাধাবে দেখছি!
বর্মটা খুবই
পুরনো, বার্নি!
লিকি-বুড়ী আর তার ভাই
এই বর্মের খোঁজ পায়।
ওই বর্ম পরেই হুনলাকা
এ-পর্যন্ত ১৬৩ জন
মানুষকে খুন করেছে!
তবে ওটাকে কাজে
লাগাতে পারলে
হয়ত এখান থেকে
উদ্ধার পাওয়া
সহজ হবে।
পরেই দ্যাখো
না!
ওরেব্বাবা,
এ যে
বিশাল বর্ম!
আরে, নিজেকে যেন অন্যরকম
লাগছে! মোটেই তো এটাকে
ভারী মনে হচ্ছে না!
আমি আর হুনলাকা তোমাদের সঙ্গে যাব।
এখানে থাকলে আমাদের মরতে হবে!
ওই ওরা
আসছে!
পালাও!
বার্নি, তুমি
তৈরী তো?

এর পর আগামী সংখ্যায়

বিড়ালের চোখ

নীহাররঞ্জন গুপ্ত

বিড়ালের চোখ মানে সত্যি - সত্যিই কোন বিড়ালের চোখ নয়।

দুটি 'স্টোন' বা পাথর, যাকে বলা হয় 'ক্যাটস আই' বা বৈদুর্যমনি, এবং দেখতে যা অবিকল বিড়ালের চোখের মতই, এ-কাহিনী তাকেই কেন্দ্র করে।

বাইরে বৃষ্টি নেমেছে, এবং বৃষ্টি যে শিগগির থামবে, তার কোন লক্ষণই নেই। এক জায়গায় একবার যাবার ছিল, কিন্তু আপাতত যে সেটা সম্ভব হবে না, তা বুঝতে পেরেই বিরূপাক্ষ তার বসবার ঘরে তৃতীয় কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে সবে একটা চার্মিনার ধরিয়েছে, সিঁড়িতে জুতোর শব্দ পাওয়া গেল।

এক জোড়া নয়, দুই জোড়া জুতোর শব্দ।

এক জোড়া জুতোর শব্দ বিরূপাক্ষর চেনা, অন্যটি ওর পরিচিত নয়, এবং জুতোর শব্দ থেকেই বিরূপাক্ষ বুঝতে পারে শিশিরের সঙ্গে কেউ আসছে। অন্য জুতোর শব্দটা ভারী নয়, হাল্কা, এবং একটু যেন থেমে থেমে শোনা যাচ্ছে। মনে হয়, দ্বিতীয় জন শিশিরকেই অনুসরণ করছে।

বিরূপাক্ষ ঘরের দরজার দিকেই তাকিয়ে থাকে। একটু পরেই শিশিরের পিছনে পিছনে থলথলে ভারী চেহারার একজন ভদ্রলোক এসে ঘরে প্রবেশ করলেন।

ওদের দিকে তাকাল বিরূপাক্ষ। "কীরে শিশির, এই বৃষ্টি মাথায় করে..."

"আলাপ করিয়ে দিই। রামদাস আগরওয়ালা, বিরাট অয়েল মার্চেন্ট, আমার যে-বইটার এখন শুটিং চলছে, তার প্রডিউসার। আর মিঃ আগরওয়ালা, এই আমার বন্ধু বিরূপাক্ষ সেন। বসুন।" কথাগুলো বলে শিশির একটা সোফায় বসল। আগরওয়ালাও বসল।

বিরূপাক্ষ একটাও কথা বলেনি এতক্ষণ। এবারে শিশিরের দিকে তাকিয়ে বললে, "কিন্তু কেন এসেছিস এই বৃষ্টি মাথায় করে, তা তো কই বললি না।"

"ও'র, মানে মিঃ আগরওয়ালার, দুটো অত্যন্ত দামী পাথর চুরি গিয়েছে, সেই ব্যাপারেই, মানে আমিই ও'কে তোর কাছে নিয়ে এলাম বিরু—"

"দামী পাথর? কী, হীরা?"

"না। হীরা নয়।"

"তবে?"

"এ পেয়ার অব ক্যাট্'স আই...দুটো ক্যাটস্ আই পাথর।"

"বৈদুর্যমণি!"

"কী বললি?"

"না বলছিলাম, ক্যাটস্ আই পাথরের এমন কী দাম?"

"সো বাত্ ঠিক বলিয়েসেন সেন সাব্।" আগরওয়ালা এতক্ষণে কেমন যেন কর্কশ খ্যানখেনে গলায় প্রথম কথা বললে, "দাম হীরার মত নয় ঠিকই, কিন্তু ঐ পাথর দুটোর দাম আমার কাছে লাখ টাকার চাইতেও বেশী।"

আগরওয়ালার কথা শুনে বিরূপাক্ষ বুঝতে পারে, হারানো ক্যাটস্ আই দুটো, দামের দিক দিয়ে ভয়ানক একটা কিছু মূল্যবান না হলেও, ওই পাথর দুটির পিছনে কোন একটা ইতিহাস আছে, যে-কারণে তার মূল্যও অনেক বেশীই ঐ মানুষটির কাছে।

বিরূপাক্ষ তার চার্মিনারে একটা টান দিয়ে বললে, "ব্যাপারটা একটু যদি খুলে বলেন, মানে ঐ যে পাথর দুটোর দামের কথা বললেন—"

"কাকু—"

একটি বালকের কণ্ঠ শোনা গেল ঠিক ঐ সময় দরজার গোড়া থেকে।

বিরূপাক্ষ সঙ্গে সঙ্গে দরজার দিকে তাকিয়ে বললে, "আরে মিতুলবাবু যে, এসো, এসো।"

একমাথা ঝাঁকড়া চুল—বড় বড় দু'টি দুষ্টুমি ভরা চোখ, বছর আষ্টেক বয়সের একটি ছেলে এসে ঘরে ঢুকলো এদিক ওদিক তাকাতে-তাকাতে।

গায়ে একটা কলার তোলা মিকি মাউস আঁকা গেঞ্জি, পরনে একটা হাফ প্যান্ট, পায়ে চপ্পল, হাতে একটা খেলনা পিস্তল। গলায় কারে ঝোলান একটা বাঁশি।

"দেখি, এ-দিকে এসো তো মিতুলবাবু। নিশ্চয়ই ভিজেছো।" বিরূপাক্ষ সস্নেহে বলল।

মিতুল বললে, "একটু একটু, বেশী নয়!"

"এই বৃষ্টির মধ্যে কেন বেরুলে?"

"বাঃ রে, সেই বেড়ালের চোখের গল্পটা যে শেষ করলে না কাল।"

"বেড়ালের চোখ—বোস্, বোস্ এই ভদ্রলোক একটা সত্যিকারের বেড়ালের চোখের গল্প আমাদের শোনাতে এসেছেন, বসে শোন," আগরওয়ালাকে দেখিয়ে বিরূপাক্ষ বললে।

আগরওয়ালা তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, "নেহি সেন সাব্, গপ্পো নয়—সাচ্ হামার ক্যাট'স্ আই দুটো খোয়া গিয়েছে—"

"হ্যাঁ—হ্যাঁ, সে তো আপনি একটু আগেই বললেন। বলুন ত এবার কী করে আপনার ক্যাটস আই দুটো খোয়া গেল।" বিরূপাক্ষ শুধালো।

"খোয়া গিয়েছে, লেকিন কী করে যে খোয়া গেল সে তো হামিও জানে না সেন সাব্।"

"তা কোথায় ছিল ক্যাট'স্ আই পাথর দুটো আপনার?"

"হামার ঘরে আয়রন সেফের মধ্যে একটা চন্দনের বাকসোর মধ্যে। হামার দাদা মানে গ্র্যান্ডফাদার দৌলত-রাম আগরওয়ালা জর্মানি থেকে একটা চমৎকার টয় এনে-ছিলেন, একটা ঠিক যেন জ্যান্ত বিল্লি, তার দুচোখে বসানো ছিল আস্‌লি অওর বহুৎ দামী দুটো ক্যাট'স আই পাথর। অন্ধকারে জ্বলতো।"

"খেলনার চোখে আসল ক্যাটস আই পাথর? আশ্চর্য তো!"

"তাজ্জব কি বাতই বটে। আসলে ঐ দুটো যে আস্‌লি ক্যাট'স আই পাথর ছিল, তাও আমার দাদা জানতেন না। একটা খেলনার দোকানে ঐ খেলার বিল্লিটা দেখে তাঁর পসন্দ হওয়ায় পঞ্চাশ মার্ক দিয়ে খেলনাটা নিয়ে আসেন কিনে।"

"তারপর?"

"পাথর দুটো যে আস্‌লি পাথর, ক্যাটস আই, তা জানতে পারলেন এদেশে আসার পর। আমি তখন ছোট, বয়স ধরুন সাত-আট হবে। টয়টা এনে দাদা আমাকে দেন। একদিন ঐ বিল্লিটা নিয়ে দাদার ঘরে বসে খেলছি, দাদার এক জানা জহুরী মৈনাক সরকার কী ব্যাপারে যেন দাদার কাছে আসেন। তিনিই আমার বিল্লিটার দিকে তাকিয়ে হঠাৎ বললেন, দেখি-দেখি বিল্লিটা। হামি অত শত জানি না, দিলাম বিল্লিটা তাঁর হাতে, তিনি পাথর দুটো দেখে বললেন দাদাকে, দৌলত-রামজী, এ তো বড় তাজ্জব কি বাত—এ দুটো দেখছি আসল এবং অনেক দামী ক্যাটস আই পাথর।

"দাদা তো তাঁর কথা শুনে অবাক। বললেন, সাচ্?"

"জী হ্যাঁ—ঐ পাথর দুটো বেচবেন?"

"কৌতুক করে দৌলতরামজী বললেন, তুমি কিনবে?"

"হাঁ, যদি বেচেন।"

"তা কত দাম দেবে?"

"পাঁচ হাজার—"

"বল কী মৈনাক?"

"জী—বেচেন তো বলুন—"

"তারপর?" বিরূপাক্ষ শুধাল।

"দাদা রাজী হলেন না। এবং ঐ ঘটনার মাস পাঁচ ছয় বাদে দাদা দৌলতরামজীকে কে বা কারা যেন হত্যা করল।"

"সে কী?" বিরূপাক্ষর কণ্ঠে বিস্ময়।

"জী হাঁ। তাঁকে মৃত অবস্থায় তাঁর শোবার ঘরে পাওয়া যায়, বুকে ছোরা বেঁধানো ছিল। পুলিশ এল এনকোয়ারি হল, কিন্তু হত্যাকারী ধরা পড়ল না।"

"আর বিল্লিটা—"

"সেটা আমার পিতাজী—ঘনশ্যাম আগরওয়ালা আমার দাদাজীর নির্দেশমত আমার কাছ থেকে নিয়ে সিন্দুকের মধ্যে একটা চন্দন বাক্সে রেখে দিয়েছিলেন। বরাবর সেখানেই সেটা ছিল, পরশু হঠাৎ জানতে পারলাম—"

"কী?"

বিল্লির দু চোখের কোটরে বসানো ক্যাট'স আই দুটো আসল ক্যাট'স্ আই নয়—নকল—দুটো ঝুটো পাথর। অথচ দিন পনের আগে মাত্র আসল ক্যাট'স আই দুটোই বিল্লির চোখে বসানো ছিল দেখেছি—"

"তা আপনি বুঝলেন কী করে যে ওদুটো ঝুটা—নকল পাথর?"

২

কথা বললে ঐ সময় বিরূপাক্ষের প্রশ্নের জবাবে শিশিরই। বললে, "উনি মানে এই রামদাস আগরওয়ালা অয়েল মার্চেণ্ট হলেও জুয়েল্স্ নিয়ে অনেক পড়াশুনা করেছেন, এবং ও'র নিজস্ব সংগ্রহে অনেক দামী দামী রেয়ার জুয়েল্স্ আছে। এটা ও'র একটা হবি বিরু।"

"আচ্ছা। তা—"

"তাছাড়া জুয়েল্স্ চিনবার ও'র অসাধারণ ক্ষমতা থাকায়; বহু নামী এবং বড় বড় জুয়েলার অনেক সময় অনেক জুয়েল্স নিয়ে সেটা আসল না নকল সেটা যাচাই করতে আসে।"

"আশ্চর্য হবি—বলতেই হবে।" বির‌্পাক্ষ বললে।

"ঐ দ‌্টো ক্যাট্স আই যেমন করেই হোক সেন সাব্...হামার...টাকার জন্য পরোয়া করবেন না—পাথর দ‌্টো হামাকে আপনি খ‌্ঁজে দিন—"

বির‌্পাক্ষ কোন কথা বলে না, নিঃশব্দে সে ধ‌্মপান করতে থাকে। চার্মিনারের গন্ধ ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়ায়। বাইরে প্রবল ধারায় ব‌্ষ্টি নেমেছে তখন।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে আবার আগরওয়ালার মিনতি-ভরা কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "সেন সাব্, বল‌্ন, কুছ্‌ বল‌্ন!" মিতুল ঐ সময় হঠাৎ বলে উঠল, "আগরওয়ালা সাহেব, কিছ্‌ ভাববেন না আপনি, ও কাকু ঠিক চোরকে ধরে দেবে! যাবে কোথায় চোর?"

বির‌্পাক্ষ হেসে ফেলে, "কিন্তু মিতুলবাব্, ব্যাপারটা সত্যিই কঠিন।"

"কিছ্‌ কঠিন না কাকু!"

"কঠিন নয় বলছ মিতুলবাব্?"

"না।"

"তা এ কথা তুমি বলছ কেন মিতুলবাব্?"

"বলব, তোমাকে আমি পরে বলব।" গম্ভীরভাবে মিতুল বললে।

"তাই বলো। আচ্ছা মিঃ আগরওয়ালা..."

"বোলিয়ে সেন সাব্!"

"পরশ্‌ মানে বিশ তারিখ এ-মাসের—জ‌্লাইয়ের যদি হয় ত আপনি এ-মাসের পাঁচ তারিখে শেষ দেখে-ছিলেন পাথর দ‌্টো ঠিক আছে? তাই তো?"

"জী হাঁ।"

"আচ্ছা ঐ পাঁচ তারিখ ও বিশ তারিখের মধ্যে সিন্দ‌্ক আর খোলেননি আপনি?"

"না।"

"আপনার ঠিক স্মরণ আছে ত?"

"হাঁ, ঠিক স্মরণ আছে। ঐ সিন্দ‌্ক তো আমি বেশী একটা খ‌্লি না, কারণ—"

"কী?"

"টাকা-পয়সা যা-কিছ্‌ হামার শোবার ঘরের একটা আয়রন-সেফেই থাকে, তাই দাদাজীর ঘরের সিন্দ‌্ক আমার খোলবার বড় একটা দরকার হয় না।"

"তবে পাঁচ তারিখেই বা ঐ সিন্দ‌্ক খ‌্লেছিলেন কেন? তারপর আবার বিশ তারিখেই বা কেন খ‌্লে-ছিলেন সিন্দ‌্কটা?"

"ঐ সিন্দ‌্কটার মধ্যে আমার বহ‌্ত সব দামী দামী জ‌্য়েল‌্স্‌গ‌্লো থাকে। পাঁচ তারিখে একজন জানাশোনা জ‌্য়েলার এসেছিল কিছ্‌ রেয়ার ক্যাট্স আই পাথর নিয়ে, তখন তাকে রেয়ার দামী ক্যাট্স আই পাথর দেখাবার জন্যই সেফ থেকে বিল্লির চোখ দ‌্টো খ‌্লে আমি নীচে নিয়ে যাই তারই বিশেষ অন‌্রোধে। তারপর—"

"বল‌্ন—থামলেন কেন?"

"দেখিয়ে এনে পাথর দ‌্টো আবার বিল্লির চোখের কোটরে বসিয়ে দিই।"

"হ‌্ঁ। তারপর পনের তারিখে—"

"একটা রেয়ার দামী রক্তম‌্খী নীলা পাথর কিনে-ছিলাম, সেটা সেফে রাখতে এসেই হঠাৎ বিল্লির চোখের দিকে তাকিয়ে আমার কেমন মনটা খট্ করে ওঠায় পাথর দ‌্টো হাতে নিয়ে এক পলক দেখেই চমকে উঠলাম—হায় রাম—এতো আস‌্লি ক্যাট্স আই নয়, ওরিজিন্যাল পাথর দ‌্টো নয়, এ যে ঝ‌্টা, নক‌্লি! সেন সাব্, হামার মাথায় যেন বজ্রাঘাত হল। আজ দ‌্দিন দ‌্রাত ভেবে আমি পাগল হয়ে যাব মনে হচ্ছে! এ কী করে সম্ভব হলো? আস‌্লি ক্যাট্স আই পাথর দ‌্টোর বদলে ঐ নক‌্লি পাথর দ‌্টো কোথা থেকে কেমন করে এল!"

"মিঃ আগরওয়ালা—"

"বোলিয়ে সেন সাব্।" আগরওয়ালার দ‌্চোখের কোণে জল।

"পাঁচ তারিখে যিনি এসেছিলেন আপনার কাছে—"

"হ্যাঁ, ঐ মৈনাক সরকারের ছেলে জ‌্য়েলার লোটন সরকার—এসেছিলেন—"

"কেন এসেছিলেন তিনি?"

"ওদের দোকানে একজন জার্মান সাহেব খরিদ্দার এসেছিলেন দ‌্টো ক্যাট্স্ আই পাথর কিনতে, কিন্তু লোটন সরকারের স্টকে যে-সব ক্যাট্স্ আই ছিল সেগ‌্লো সাহেবের পছন্দ হয় না। বলে লোটনকে, সে ঠিক যেরকম পাথর খ‌্ঁজছে সে-রকম পাথর সে ঐগ‌্লোর মধ্যে পাচ্ছে না। ওগ‌্লো নাকি সব ঝ‌্টা পাথর। সে দশ বিশ যা লাগে দিতে রাজী, কিন্তু আস‌্লি মাল চাই। লোটন তখন সাহেবকে বলে, পাথর-গ‌্লো কোনটাই ঝ‌্টা নয়, এবং সেটা সে আমাকে দিয়ে প্রমাণ করিয়ে দেবে, বলে সে আমার পরিচয় দেয় সাহেবকে।"

"তারপর?"

"সাহেব ইণ্টারেস্টেড হয়ে ওঠে এবং তাকে আমার কাছে নিয়ে আসবে বলে। আমি যদি ঠিক আছে বলি তবে সে কিনবে। সেই মত লোটন সরকার সাহেবকে আমার কাছে নিয়ে আসে, আমি লোটনের পাথর থেকে দ‌্টো বাছাই করে দিয়ে বলি, ঐ দ‌্টো সাহেব কিনতে পারে—"

"সাহেবের খ‌্ঁতখ‌্তুনি কিন্তু তব‌্ যায় না। সেই সময় লোটনই আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলে, আপনার কাছে তো সেই পাথর দ‌্টো আছে—দিন না বেচে—"

"আপনি কী বললেন?"

"বললাম, না। ও পাথর আমি বেচবো না লক্ষ টাকার বিনিময়েও।

"লোটন তখন বলে, সাহেবকে পাথর দ‌্টোর কথা বলব ভাবছিলাম।"

"আমি বললাম, না।"

"তারপর?"

"কিন্তু লোটন সরকার তার কথা রাখেনি, সাহেবকে পাথর দ‌্টোর কথা বলে দিল। সাহেব তখন পাথর দ‌্টো দেখতে চায়।"

"আর আপনি সিন্দ‌্ক থেকে এনে পাথর দ‌্টো দেখান?" বললে বির‌্পাক্ষ।

"হ্যাঁ।"

"এবং সাহেব কিনতে চায় পাথর দ‌্টো দেখেই, তাই কি?"

"হ্যাঁ।"

"মিঃ আগরওয়ালা, ঐ দিনই, আমার অন‌্মান যদি মিথ্যা না হয়, আপনার অজ্ঞাতে কোন এক ফাঁকে আসল ক্যাট্স্ আই দ‌্টো বদল হয়ে গিয়েছে।"

"সিয়ারাম, কী বোলচেন আপনি সেন সাব্?"

"তাই। আপনি টেরও পাননি। শ‌্ন‌্ন, আপনি এক

কাজ করুন..."

"কী?"

"কাল সকালের দিকে লোটন সরকারকে আপনার বাড়িতে আপনি ডেকে পাঠান।"

"ডেকে পাঠাব? কেন?"

"বলবেন, ক্যাটস আই দুটো আপনি বিক্রি করবেন স্থির করেছেন। এবং বদলে দুটো ক্যাটস আই আসলি কিনতে চান।"

"কিন্তু—"

"যা বলছি, তাই করুন। আমিও সেখানে উপস্থিত থাকব। অন্য এক জুয়েলারের ছদ্মবেশে।"

৩

ওদের বিদায় দিয়ে বিরূপাক্ষ মিতুলকে বললে, "বেড়ালের চোখের গল্প শুনলে মিতুলবাবু?"

"ওতো সত্যি ঘটনা।" মিতুল বললে, "পাথর দুটো নিশ্চয়ই চুরি করেছে—"

"কে চুরি করেছে বলে তোমার মনে হয়?"

"ঐ লোটন সরকার লোকটাই মনে হয়।"

"কেন?"

"জানি না, তবে আমার মনে হয় সে-ই ম্যাজিক করেছে।"

"তুমি ম্যাজিক করতে পারো তার মতো?"

"কীরকম করে করব?"

"আমি তোমাকে শিখিয়ে দেবো—তুমিও কাল সকালে আমার সঙ্গে যাবে।"

"সত্যি।"

"হ্যাঁ, বৃষ্টি এখন ধরেছে, এবারে বাড়ি যাও।"

"মিতুল চলে যাবার পর জামাটা গায়ে দিয়ে বিরূপাক্ষ বাড়ি থেকে বের হল তার—শিশিরের মতে— মান্ধাতা আমলের ঝরঝরে অস্টিন গাড়িটা নিয়ে।

প্রথমেই গেল জর্মন কনসুলেটে। সেখানকার কনসাল জেনারেলের সঙ্গে তার পরিচয় ছিল।"

মিঃ রিবেনট্রপ বিরূপাক্ষকে দেখে বললেন, "গুড্ মর্নিং মিঃ সেন, কী ব্যাপার, এই বৃষ্টির মধ্যে?"

"আপনি কিছুদিন আগে একজোড়া মূল্যবান হিস্টোরিক ক্যাটস্ আইয়ের কথা বলেছিলেন, মনে আছে?" আপনাদের দেশের এক ধনীর প্রপার্টি ছিল সে-দুটো। আশ্চর্যজনকভাবে বছর পঁচিশ আগে

খোয়া যায়. অনেক চেষ্টা করেও তার কোন কিনারা করতে পারা যায়নি এখনো।"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা আপনি জানেন কী করে সে দুটো খোয়া গিয়েছিল?"

"সে এক বিচিত্র এবং রহস্যজনক ব্যাপার মিঃ সেন। ব্যাপারটা ঘটেছিল ঠিক প্রথম মহাযুদ্ধের বছর চারেক পরে। এক খেয়ালী ধনীর জুয়েলস সংগ্রহের বাতিক ছিল। ঐ রেয়ার ক্যাট'স আই দুটো তিনি এক পারস্যের জুয়েলারের কাছ থেকে কিনে একটা টয় বেড়ালের চোখে পাথর দুটো বসিয়ে তাঁর সেফে রেখেছিলেন, হঠাৎ এক-দিন তিনি দেখতে পেলেন—"

"পাথর দুটো চুরি গিয়েছে!"

"হ্যাঁ, কিন্তু কী করে যে বাড়ির মধ্যে থেকে চুরি গেল সেটাও আশ্চর্য! তাঁরা অনেক চেষ্টা করলেন পুলিশ ও ডিটেকটিভ দিয়ে, কিন্তু সে দুটো আর পাওয়া গেল না, এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। এদিকে এত বছর পরে একটা মজার ব্যাপার ঘটেছে মিঃ সেন—"

"মজার ব্যাপার?"

"হ্যাঁ, সেই পরিবারেরই একটি ছেলে হঠাৎ যেন কী করে সংবাদ পায় যে, সে-দুটো ইনডিয়াতে আছে, সে এখানে চলে আসে—"

"কবেকার কথা এটা?"

"এই তো মাস দুই হল তিনি এখানে এসেছেন পাথর দুটোর খোঁজে।"

"খোঁজ পেয়েছেন তিনি কিছু?"

"হ্যাঁ, কিন্তু যাঁর কাছে ক্যাট'স আই দুটো ছিল, তিনি বলে দিয়েছেন, পাথর দুটো বিক্রি করবেন না লক্ষ টাকা দিলেও—"

"পাননি তিনি পাথর দুটো তাহলে আজও?"

"না, তবে যে বাঙালী জুয়েলার তাঁকে সেই ভদ্র-লোকের কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনি বলেছেন, কিছুদিন অপেক্ষা করতে, যে-ভাবেই হোক ক্যাট'স আই দুটো যাতে পাওয়া যায়, তার ব্যবস্থা তিনি করবেন, ছেলেটি তাই এখনো কলকাতাতেই আছেন।"

"কোন হোটেলে?"

একটা হোটেলের নাম করলেন কনসাল।

ধন্যবাদ জানিয়ে ঘর থেকে বের হয়ে এল বিরূপাক্ষ।

কনসুলেট থেকে বের হয়ে বিরূপাক্ষ হোটেলে গেল।

নিজের ঘরেই ছিলেন জর্মন ভদ্রলোক। কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলে বিরূপাক্ষ এক সময় ঘর থেকে বের হয়ে এল।

বাড়িতে ফিরে আসার ঘণ্টা দুই বাদে রামদাস ফোন করলেন বিরূপাক্ষকে। বললেন, লোটন সরকারকে তিনি ফোন করেছিলেন, কিন্তু লোটন সরকার জানিয়েছে—

"কী?"

সাহেব নাকি আর কেনার ব্যাপারে ইনটারেসটেড নয়, এবং সে চলে গিয়েছে।"

"হুঁ। ঠিক আছে।" বিরূপাক্ষ বললে, "কাল আপনি ঠিক সকাল সাড়ে এগারটায় এলিট হোটেলের তিনতলায় ১৪৫ নং ঘরে আসুন—"

"কিন্তু—"

"যা বলছি তাই করবেন, মনে রাখবেন যেন. আসতে ভুল না হয়।" বিরূপাক্ষ ফোন রেখে দিল।

পরের দিন সকাল সাড়ে নটা নাগাদ বিরূপাক্ষ মিতুলকে নিয়ে হোটেলে এলো সেই জর্মন সাহেবের ঘরে। এক প্রৌঢ় মুসলমান জহুরীর ছদ্মবেশে। এক-মুখ দাড়ি, জোব্বা ও পায়জামা পরনে, মাথায় জালি ফেজ, চোখে চশমা। কী করতে হবে, জর্মন সাহেবকে সব বলে বিরূপাক্ষ মিতুলের দিকে তাকিয়ে ডাকল, "মিতুল..."

"কাকু—"

"তুমি ঐ জর্মন সাহেবের ঘরে বসে শুধু দেখে যাবে. একটা কথাও বলবে না। বুঝেছো? আর যা বলেছি. তাই করবে?"

"হ্যাঁ।"

ঠিক পূর্ব অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট মতো লোটন সরকার এলেন না, এলেন অন্য-এক ভদ্রলোক। মুখে কাঁচা-পাকা চাপ দাড়ি, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, পরনে দামী সুট।

জর্মন সাহেব বললেন, "আপনি? মিঃ সরকার এলেন না যে?"

ভাঙা ভাঙা গলায় আগন্তুক বললেন, "হ্যাঁ তিনি আসেন নি, কারণ আমিই ক্যাটস আই দুটো বেচবো, তিনি নন।"

"আপনি বেচবেন?" জর্মন সাহেব বললেন।

"হ্যাঁ, পাথর দুটো আমার কাছেই আছে। কিন্তু দাম দিতে হবে ১ লাখ ৭৫ হাজার টাকা। ক্যাশ।"

"সে তো কালই মিঃ সরকারকে জানিয়ে দিয়েছিলাম. আমি রাজী আছি।"

"তবে টাকা বের করুন।"

"কিন্তু পাথর দুটো আমি একটু যাচাই করে নিতে চাই।"

"ভয় নেই, ঠিক পাথরই পাবেন।"

"সেটাই আমি এই জুয়েলারটিকে দিয়ে যাচাই করে নিতে চাই।"

"বেশ, দেখুন।" আগন্তুক জামার বুক-পকেট থেকে পাথর দুটো বের করলেন।

বিরূপাক্ষ পাথর দুটো হাতে নিয়ে পকেট থেকে একটা লেন্স বের করে, ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করবার জন্য—হঠাৎ ঐ সময় একটা বিড়াল ডেকে উঠলো—মিঁয়াও।

"আরে. হোটেলের মধ্যে বিল্লি এলো কোথা থেকে?"

আবার মিঁয়াও।

সামনের ঘর থেকেই আসছে বিড়ালের ডাকটা। সবাই ঐ দিকে তাকায়।

সেই মুহূর্তেই বিরূপাক্ষ আসল ক্যাট'স আই দুটোর সঙ্গে নকল দুটো ক্যাট'স আই বদল করে বলে "এটা তো ঝুটা পাথর।"

"ঝুটা? কী যা তা বলছেন!" আগন্তুক চিৎকার করে উঠলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তে আগরওয়ালা এসে ঘরে ঢুকলেন।

বিরূপাক্ষ বললে, "আসুন আসুন মিঃ আগরওয়াল! আপনার আসল ক্যাটস আই দুটো পাওয়া গিয়েছে।"

"গিয়েছে পাওয়া?"

"হ্যাঁ, সে দুটো সেদিন এই লোটন সরকার আপনার বাড়িতে হাত-সাফাই করেছিল।" বলে বিরূপাক্ষ এক হেঁচকা টানে আগন্তুকের মুখ থেকে দাড়ি খসিয়ে আনল।

মিতুল খিল খিল করে হেসে ওঠে. তারপরই ডেকে ওঠে—মিঁয়াও।

লোটন সরকার অধোবদন।

"মিঃ সরকার. আপনাদের বনেদী ফ্যামিলির একটা প্রেসটিজ আছে, তাই আপনাকে এবারে ছেড়ে দিলাম।"

লোটন সরকার মাথা নিচু করে ঘর থেকে বের হয়ে গেল নিঃশব্দে যেন চোরের মতই।

বিরূপাক্ষ পকেট থেকে তখন ক্যাটস আই দুটো বের করে মিঃ আগরওয়ালার হাতে দিতে দিতে বললে, "মিঃ আগরওয়াল, একটা অনুরোধ করবো. যদি সম্ভব হয় এই জর্মন ভদ্রলোককে ক্যাটস আই দুটো বিক্রি করে দিন। নচেৎ কে জানে আবার হয়ত আপনাকে বিপদে পড়তে হবে ঐ চোখ দুটোর জন্য, হয়ত তাতে প্রাণ-হানিও ঘটতে পারে।"

পথে এসে গাড়ি চালাতে চালাতে পাশে উপবিষ্ট মিতুলের দিকে তাকিয়ে বিরূপাক্ষ বললে, "চমৎকার 'মিমিক্রি' হয়েছিল আজ মিতুলবাবু তোমার। লোটন সরকার একা নয়. সবাই আমরা তোমার বিড়ালের ডাক শুনে চমকে উঠেছিলাম. এবং লোকটা ঐ ভাবে চমকে না উঠলে আমি অত সহজে বোধ হয় হাত সাফাই করতে পারতাম না।"

বাঁ হাত দিয়ে মিতুলের পিঠটা চাপড়ে দিল বিরূপাক্ষ।

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

ইন্দ্রমিত্র

গ্রামের নাম উটরো বা আবাজী দুর্গাপুর। বর্ধমান জেলার গ্রাম। বৈকুণ্ঠ সর্দার সে-গ্রামের প্রজা একজন। চৌকিদার।

সেকালে চৌকিদারি মুখের কথা নয়। দিনেদুপুরে চুরি-ডাকাতি হত সেসময়ে। অতএব. যে-সে চৌকিদার হলে চলত না।

বৈকুণ্ঠ সর্দারের নামডাক ছিল।

মানুষের শরীরে অসুখ-বিসুখ তো আছেই। বৈকুণ্ঠ সর্দারের অসুখ-বিসুখ করলে মাঝে মাঝে তার স্ত্রী দ্রবময়ী তার বদলে চৌকিদারি করতে বেরোতেন। উপরওয়ালারা অবশ্যি সে-খবর জানত না। কিন্তু গ্রামের লোকজন জানত।

বৈকুণ্ঠ সর্দারের মৃত্যু হল। বৈকুণ্ঠের মৃত্যুর আগে তার ছেলে মারা গেছে। রেখে গেছে একটি অপোগণ্ড শিশু।

নাতিকে নিয়ে দ্রবময়ীর দুর্ভাবনা হল। নিজেই বা কী খাবেন, নাতিকেই বা কী খেতে দেবেন? কেমন করে দিন চলবে?

গ্রামের লোক পরামর্শ দিল—দ্রবময়ী, তুমি চৌকিদারির জন্য দর-খাস্ত করো।

নাতিকে কোলে নিয়ে দ্রবময়ী একজন প্রতিবেশীর সঙ্গে কালনায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। স্বামীর চাকরিতে বহাল হতে চান দ্রবময়ী।

উপরওয়ালারা এককথায় নামঞ্জুর করে দিলেন না। জিজ্ঞেস করলেন—তুমি লাঠিখেলা জানো?

দ্রবময়ী ঘাড় নেড়ে জানালেন—হ্যাঁ, জানি।

কালনার কর্তারা দ্রবময়ীর দর-খাস্তখানা সুপারিশ করে দিলেন। বলে দিলেন—তুমি তোমার নাতিটিকে নিয়ে বর্ধমানে যাও।

বর্ধমানে পুলিশের বড়সাহেব দ্রবময়ীর দরখাস্ত পেয়ে খুব খুশি হলেন। ছুটে এলেন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে। একজন বাঙালী মেয়ে লাঠিখেলার পরীক্ষা দিয়ে চৌকিদারি নিতে এসেছে. এ একটা ছুটে এসে বলবার মতো ব্যাপার বইকী।

বর্ধমানে সাড়া পড়ে গেল। বৈঠক বসল কাছারির মাঠে। দুখানা চেয়ারে বসেছেন পুলিশসাহেব আর ম্যাজি-স্ট্রেট সাহেব। মস্ত ভিড় মাঠে।

যথাসময়ে কোলের নাতিটিকে একজনের কাঁধে চাপিয়ে দ্রবময়ী মাঠের মধ্যিখানে এসে দাঁড়ালেন। কোমরে কাপড় বেঁধে সাহেবদের সামনে হাঁটু গেড়ে বসলেন। মাথা নিচু করে নমস্কার জানালেন দর্শকদের। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বললেন—হুজুর,. একলা তো লাঠিখেলা হয় না। কে আমার সঙ্গে খেলবে, আসুক।

নিজের ইচ্ছায় কোনও পুরুষ-মানুষ আসবে না নিশ্চয়ই। স্ত্রীলোকের সঙ্গে লাঠি খেলে কে নিজের মান খোয়াবে?

পুলিশসাহেব ইশারা করলেন। তখন একজন কনস্টেবল এগিয়ে এল। খেলা আরম্ভ হল। কিন্ত তাকে ঠিক খেলা বলা চলে না। কনস্টেবল আসলে লাঠি খেলছে না লাঠি খেলার ভান করে যাচ্ছে কেবল। সব বুঝতে পেরে-ছেন দ্রবময়ী। সাহেবকে বললেন—হুজুর, আমাকে কি সঙ সাজিয়ে তামাসা দেখছেন? এ কি লাঠিখেলা হচ্ছে?

আবার আরেক রকম ইঙ্গিত করলেন পুলিশসাহেব। দশ মিনিট খেলা হল। হ্যাঁ, এবার দ্রবময়ীর লাঠি কনস্টেবলের লাল পাগড়িতে লেগেছে।

সাহেব খেলা বন্ধ করার হুকুম দিলেন। দ্রবময়ীর প্রশংসা করতে লাগলেন। কিন্তু দ্রবময়ী তাতে খুশি হলেন না। হাতজোড় করে সাহেবকে বললেন—দুজন খেলোয়াড় আমাকে মারতে আসুক। দেখুন আমি নিজেকে সামলাতে পারি কিনা।

সেইরকম হল। দুদিক থেকে দুজন তাড়া করল দ্রবময়ীকে। দু-হাতে দু-গাছা লাঠি নিয়ে দ্রবময়ী দুজনকে ঠেকিয়ে দিলেন।

পুলিশসাহেব দ্রবময়ীকে বললেন—তুমার মরদ কি কামমে তুম বহাল হুয়া।

শুধু তাই নয়. ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে পরামর্শ করে পুলিশসসাহেব আবার দ্রবময়ীকে বললেন—তুমারা বর্কশিশ দশ রুপেয়া।

আর একজন বাবুকে বলে দিলেন—দ্রবময়ীর নাতিটির জন্যে একসের মিঠাই দিতে হবে।

বিমল কর

কাপালিকেরা এখনও আছে

উপন্যাস

আগে যা ঘটেছে

একদিন একেবারে আচমকা তারাপদ একটি চিঠি পেল। সলিসিটার মৃণাল দত্ত তারাপদকে দেখা করতে বলেছেন। চিঠি পড়ে মনে হল, ভুজঙ্গভূষণ হাজরা নামের এক ভদ্রলোকের দেড় দু লাখ টাকার সম্পত্তি তারাপদর ভাগ্যে নাচছে। পদবী থেকে অনুমান হয়, তিনি তারাপদর এক পিসেমশাই। তারাপদ তার ডাক্তার-বন্ধু চন্দনকে নিয়ে মৃণাল দত্ত-র বাড়িতে দেখা করতে গেল সেদিনই সন্ধে বেলায়।

মৃণাল দত্ত পরীক্ষা করলেন তারাপদকে; ভুজঙ্গভূষণের ঠিকানা দিলেন। মধুপুরের কাছে শঙ্করপুরে ভুজঙ্গভূষণ থাকেন। কিছুদিন আগে তাঁর এক দুর্ঘটনা ঘটেছে, তিনি মরণাপন্ন।

সেদিন রাত্রেই তারাপদ চন্দনকে সঙ্গে নিয়ে হাওড়া স্টেশন থেকে গাড়িতে উঠল। গাড়িতে আলাপ হল এক মজার মানুষের সঙ্গে, নাম তাঁর কিঙ্করকিশোর রায়, ছোট করে 'কিকিরা'।

তারাপদরা কিকিরাকে প্রথমে সন্দেহ করতে লাগল। পরে সে-সন্দেহ দূর হল। মনে হল, কিকিরা তাদের বন্ধু।

শঙ্করপুরে ভুজঙ্গভূষণের বাড়িতে এসে তারাপদরা দেখল, বাড়িটা একটা দুর্গ। লোকজন কিন্তু চোখেই পড়ে না। সেখানে তারাপদ তার পরিচিত সাধুমামাকে দেখতে পেল। কিন্তু সাধুমামা তারাপদকে চিনতে পারলেন না যেন, কথাও বললেন না। বোবা হয়ে থাকলেন।

সন্ধে বেলায় এক রহস্যময় ঘরে আরও রহস্যজনক অবস্থায়, ভুজঙ্গভূষণের সঙ্গে দেখা হল। এই ঘরে তিনি মৃতজনের আত্মাকে ডেকে নিয়ে আসেন। এই রকম এক আত্মা এসে বিচিত্র এক কান্ড করল। একটা রঙীন বল শূন্যে লাফাতে লাফাতে ঘরময় ঘুরে বেড়াল। তারাপদরা এই দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে গেল।

॥ ৭ ॥

পরের দিন সকালেও তারাপদ নিজেকে সামলে নিতে পারল না। চোখ মুখ বসে গিয়েছে, শুকনো চেহারা। পর পর দু রাত্রিই ঘুম হল না বেচারীর; আগের দিন কেটেছে ট্রেনে; আর কাল সারা রাত বিছানায় শুয়ে ভয়ে আতঙ্কে মরেছে। চন্দন ডাক্তার-মানুষ, তার অনেক সাহস, মড়া কাটা থেকে শুরু করে সে কত কী করেছে, সহজে ঘাবড়ে যাবার ছেলে চন্দন নয়; তবু চন্দনও কেমন বোকা হয়ে গেছে। ভয়ও পেয়েছে খানিকটা। দুজনে আলোচনা করেও বুঝতে পারছে না—এরকম ঘটনা কেমন করে ঘটে? ছোট ফুটবল সাইজের একটা বল কেমন করে হাওয়ার মধ্যে নেচে বেড়ায়? ভৌতিক ব্যাপার? না ম্যাজিক?

যদি বিশ্বাস করে নেওয়া যায় ম্যাজিক, তবে ভয়-ভাবনার কিছু থাকে না। কিন্তু ম্যাজিক বলে ঠিক বিশ্বাস করতেও মন চাইছে না।

সকাল বেলায় মুখটুখ ধুয়ে কোনো রকমে চা খেয়ে দুজনে বাড়ির বাইরে এসে দাঁড়াল। বাগানে।

তারাপদ বলল, "চাঁদু, কিকিরার কাছে যেতেই হবে।"

চন্দন বলল, "আমিও তাই ভাবছি। কখন যাবি?"

"বিকেলে যাওয়া যাবে না। ভুজঙ্গ আবার আজ বিকেলের পর আমাদের সঙ্গে দেখা করবে বলেছে। যেতে হলে এখনই যাওয়া দরকার।"

চন্দন বলল, "চল, আমরা ঘুরে আসি।"

"কাউকে কিছু বলতে হবে না?"

"কী দরকার। নতুন জায়গা, কেমন সুন্দর দেখতে, আমরা একটু বেড়িয়ে বেড়াচ্ছি—এই ভাবে যেতে হবে। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলব, বেড়াচ্ছি। তার পরও যদি খোঁচায়, বলব—স্টেশনে যাচ্ছি ব্লেড কিনতে কিংবা সিগারেট কিনতে।"

তারাপদ বলল, "ঠিক আছে, চল।"

বাগানের মধ্যেই সামান্য সময় দুজনে বেড়ানোর ভাব করে ঘুরে বেড়াল। বাড়ির চার পাশ না হলেও—অন্তত তিনটে পাশ দেখে নিল। ভুজঙ্গভূষণের এই পুরী যতই দুর্গ হোক, কেউ যদি পালাতে চায়—নিশ্চয় পালাতে পারে। সব দিক সর্বক্ষণ আটকে রাখা সম্ভব নয়। মানুষ জেলখানা থেকেও পালায়—এখান থেকে পালানো নিশ্চয় তার চেয়ে কঠিন নয়।

বাগানে বেড়াতে বেড়াতেই মৃত্যুঞ্জয়কে দেখা গেল।

চন্দন বলল, "তারা, তোকে এবার একটু খেলতে হবে।"

তারাপদ অবাক চোখে বন্ধুর দিকে তাকাল।

চন্দন বলল, "তুই ওই মৃত্যুঞ্জয়টাকে ডাক। ডেকে বল, ছোট ফটকের তালা খুলে দিতে। বলবি, আমরা বেড়াতে যাব। শোন, মিনমিন করে কথা বলবি না ওর সঙ্গে, হুকুমের গলায় বলবি।"

"এখানকার ছোট মহারাজকে হুকুম? তুই বলছিস কী?" তারাপদ ঘাবড়ে গিয়ে বলল।

চন্দন বলল, "আমি ঠিকই বলছি। তুই ভুজঙ্গ-

ভূষণের সম্পত্তির মালিক হতে যাচ্ছিস। ও বেটার কোনো রাইট নেই এখানে; তোর আছে। তুই এখন থেকেই এটা দেখিয়ে যা।"

"তারপর যদি—"

"যদি-টদি বাদ দে; নো রিস্ক নো গেইন্।...তুই চালা না—তারপর আমি আছি।" বলে চন্দন মাতব্বরের মতন মৃত্যুঞ্জয়কে ডাকল।

মৃত্যুঞ্জয় কাছে এলে তারাপদ ছোট ফটকের তালা খুলে দিতে বলল। ঠিক হুকুমের গলায় অবশ্য বলতে পারল না।

খুবই আশ্চর্য যে মৃত্যুঞ্জয় সাধারণভাবে জিজ্ঞেস করল, তারাপদরা কোথায় যাবে? তারপর চাকরকে ডেকে তালা খুলে দিতে বলল।

ফটকের বাইরে এসে তারাপদরা হাঁটতে লাগল। মাঠ ময়দান, গাছপালা, দূরের জঙ্গল—যেদিকে চোখ যায়—সব যেন রোদে ভেসে যাচ্ছে। শীতের রোদ, তবু কী গাঢ়, কত উষ্ণ। আকাশ নীল, রোদ যেন উপচে পড়ছে আকাশ থেকে, মাঠঘাটের ভেজা ভাব শুকিয়ে এসেছে, শিশির আর চোখে পড়ছে না। এখনও শীতের সেই শনশন হাওয়া দেয়নি, অল্পস্বল্প যা আছে তাতে ভালই লাগে।

কাল রাত্রের সেই অন্ধকার রহস্যময় ঘর, সেই আত্মার ব্যাপার-স্যাপার, বলের নাচ যেন অন্য একটা জগৎ। আর এখনকার এই রোদ, মাঠ, কুলঝোপ, আতা-গাছের ডালে বসে পাখির ডাক—এ আর-এক জগৎ। এই জগৎ তারাপদরা বুঝতে পারে, অনুভব করতে পারে, কিন্তু কালকের ওই রহস্যময় ঘটনার কিছুই বুঝতে পারে না। মনে হয় যেন দুঃস্বপ্ন।

হেঁটে আসতে আসতে দুজনেই গল্প করছিল।

তারাপদ জিজ্ঞেস করল, "চাঁদু, তুই তো ডাক্তার। আত্মা-টাত্মা কখনো দেখেছিস?"

"না ভাই আমি মর্গও দেখেছি, বাট নো আত্মা।"

"আমি প্ল্যানচেট দেখেছি," তারাপদ বলল, "পরলোক-টরলোক নিয়ে একবার একটা বইও পড়েছিলাম। কিছু বুঝি নি।"

"এসব গাঁজাখুরি...!"

"কিন্তু কাল আমরা নিজের চোখে যা দেখলাম—?"

"তাই তো ভাবছি। পি সি সরকারের ম্যাজিক যেন!"

এমন সময় একটা দেহাতী গোছের লোককে সাইকেলে করে আসতে দেখা গেল দূরে। ভুজঙ্গ-ভবনের দিক থেকে আসছে। চন্দনের চোখে পড়েছিল।

চন্দন বলল, "তারা, ওই লোকটা এদিকে কেন আসছে?"

তারাপদ দেখল। বলল, "আমরা কোথায় যাচ্ছি দেখতে আসছে বোধ হয়।"

"তার মানে ভুজঙ্গ আমাদের ওপর চোখ রাখতে চায়? না, মৃত্যুঞ্জয়?"

"বুঝতে পারছি না।"

দুজনেই হাঁটতে লাগল, দাঁড়াল না। চন্দন হঠাৎ বেয়াড়া গলায় গান গাইতে শুরু করল যেন খুব খুশ মেজাজে রয়েছে।

লোকটা কাছাকাছি এল। পুরোনো সাইকেল, মাঝ বয়েসী লোক; বাঙালী বলে মনে হয় না। তারাপদদের কাছাকাছি এসেও দাঁড়াল না। একবার শুধু দেখল,

খাতিরের ভঙ্গিতে মাথা নোয়ালো, তারপর চলে গেল।

সাইকেল খানিকটা এগিয়ে যেতে চন্দন বলল, "তারা, আমার মনে হচ্ছে লোকটা নজর রাখার জন্যে এসেছে। কিন্তু কেন? ভুজঙ্গ না মৃত্যুঞ্জয়, কার হুকুমে ও নজর রাখছে? আমরা পালিয়ে যাব ভাবছে নাকি?"

তারাপদ বলল, "চাঁদু, সম্পত্তির নিকুচি করেছে, চল, আমরা এই ভুতের বাড়ি থেকে পালাই।"

মাথা নেড়ে চন্দন বলল, "এত সহজে পালাব কেন রে? আরও দু-একটা দিন দেখি। অন্তত তোর পিসেমশাইয়ের অরিজিন্যাল মুখটা একটু দেখি। পালাবার জন্যে তুই ভাবিস না। ওটা আমার হাতে ছেড়ে দে। সে ব্যবস্থা আমি করে রেখেছি। পালাবার জায়গা দেখে রেখেছি ভাই।"

আরও একটু এগিয়ে আসতেই আচমকা পাখির ডাকের মতন শোনা গেল। ডাকটার একটা আলাদা সুর ছিল, কানে লাগে। চন্দন দাঁড়িয়ে পড়ল, তার দেখাদেখি তারাপদও দু-চার পা এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। চন্দন আশেপাশে তাকাল। ডান দিকে খানিকটা উঁচু জমি, মস্ত মস্ত দুই পাথর, আশেপাশে ছোট ছোট পাথর-টুকরো পড়ে আছে। রুক্ষ জায়গা, কাঁকরভরা মাটি। কোনো গাছপালা চোখে পড়ছে না। কাঁটা গাছের ছোট্ট একটু ঝোপ পাথরের পাশে। কোথাও কোনো পাখির চিহ্ন নেই।

চন্দন কিছু বোঝবার আগেই একটা ছোট ঢিল এসে পায়ের কাছে পড়ল। তারপরই পাথরের আড়াল থেকে কিকিরার মুখ উঁকি মারল।

"আরে, আপনি?" চন্দন অবাক। তারাপদকে বলল, "কিকিরা।"

হাতছানি দিয়ে কিকিরা ডাকলেন।

তারাপদরা এগিয়ে গেল।

কিকিরা বললেন, "এখানে আসুন, স্যার, গুঁড়ি মেরে চলে আসুন।"

তারাপদরা পাথরের আড়ালে গেল।

কিকিরা বললেন, "একটু আগেই এক চেলা গেল, দেখেছি। দেখেই শেলটার নিয়েছি।"

"আমরা আপনার কাছেই যাচ্ছিলুম।"

"আমিও আপনাদের খোঁজে আসছিলাম। মনে হচ্ছিল, দেখা হয়ে যেতেও পারে।"

"ওই লোকটাকে আপনি চেনেন?"

"না। তবে আন্দাজ করতে পারি।"

"ও কি আমাদের ওপর নজর রাখছে?"

"মনে তো হয়, স্যার। তবে ও বেটা অনেকটা চলে গেছে। দেখতে পাবে না আর। যদি দেখি ফিরে আসছে, আপনাদের বলব। আপনারা সোজা ভুজঙ্গ ভয়ালের বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করবেন।"

চন্দনরাও একবার দেখে নিল। লোকটা বেশ দূরে চলে গেছে। সেখান থেকে পাথরের আড়ালে তাদের দেখতে পাবে না। না পেলে কী ভাববে বলা মুশকিল। মাঠের মধ্যে দুটো লোক নিশ্চয় ভ্যানিশ হয়ে যেতে পারে না। কিন্তু অন্য সন্দেহই বা কী করবে? ভাববে, এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কিকিরা বলল, "খবর বলুন, স্যার।"

তারাপদ বলল, "খবর অনেক। কিন্তু এখানে বলব?"

"এখানেই স্যার নিরাপদ। যদি লোকটা এখনি না ফিরে আসে, তা হলে এই হল বেস্ট জায়গা।"

"যদি আসে?"

"সামনে গিয়ে মনের সুখে নিজেরা গল্প করবেন, লাফাবেন, নাচানাচি করবেন যেন ওর মনে হয় আপনারা কলকাতার লোক, ছেলেমানুষ, বাইরে বেড়াতে এসে বেজায় খুশী হয়েছেন।"

"আপনাকে যদি দেখতে পায়?"

"পাবে না স্যার, পাবে না। আমি মিলিটারীর পজিসন নিয়েছি।"

চন্দন একটা সিগারেট ধরাল।

কিকিরা বললেন, "দিন স্যার, একটা ধোঁয়া দিন। টানি।"

কিকিরা সিগারেট নিয়ে ধরালেন।

তারাপদ খুব সংক্ষেপে গতকালের ঘটনা বলল। বলে ভুজঙ্গভূষণের সঙ্গে সাক্ষাতের বিবরণটা দিল। তার গলার স্বর থেকে বোঝা যাচ্ছিল, তারাপদ উত্তেজনা, ভয়, বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দ্বিধার মধ্যে রয়েছে।

কিকিরা মনোযোগ দিয়ে সব শুনলেন। আজ তাঁর বেশবাস খানিকটা অন্যরকম। পরনে পাজামা, গায়ে কেমন এক আলখাল্লা ধরনের জামা। মাথায় গরম হনুমান-টুপি। টুপির তলার দিকটা গুটোনো। পায়ে খাকি কেডস্ জুতো।

চন্দন বলল, "মশাই, ভুজঙ্গ আত্মা নামায়; আপনি জানেন?"

কিকিরা ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন। "জানি।"

"ব্যাপারটা কী?"

"ব্যাপারটা আপনারা এমনিতে বুঝবেন না। একে বিদেশীরা সেঁয়াস বলে।"

"সেঁয়াস? সেটা আবার কী?"

"সেটা একটা অদ্ভুত ব্যাপার, আত্মাটাত্মা নামানো হয়, আত্মাদের দিয়ে নানারকম ভেলকি দেখানো হয়।"

"আপনি আত্মা মানেন?"

"আমার মানামানির কথা জিজ্ঞেস করবেন না। আত্মা মানি কিনা আমি জানি না। তবে ভুজঙ্গর আত্মাটাত্মা মানি না।"

তারাপদ বলল, "তা হলে ও কেমন করে ওই অদ্ভুত ঘটনাটা ঘটাল?"

কিকিরা চুপ করে থেকে কিছু ভাবলেন, তারপর বললেন, "কেমন করে ঘটল তা আমি বলতে পারব না। নিজের চোখে দেখলে বলবার চেষ্টা করতাম। কিন্তু স্যার, আমি বলছি, এ হল ভেলকি। বড় রকমের ম্যাজিক। বিশ্বাস করবেন না। ভুজঙ্গ এই ভেলকি দেখিয়েই তার প্রতিপত্তি করেছে, বহু লোকের সর্বনাশও করেছে সেই সঙ্গে। কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত পাগলের মতন হয়ে গেছে, কারও কারও যথাসর্বস্ব গিয়েছে। আপনারা ওই পিশাচের ধোঁকায় ভুলবেন না।"

চন্দন বলল, "আপনি আমাদের কী করতে বলছেন তা হলে?"

"আমি বলছি, আপনারা রয়েসয়ে থাকুন। ভয় পাবেন না। চোখ খুলে ভুজঙ্গর বাড়ির সব কিছু লক্ষ করার চেষ্টা করুন। আপনাদের ও প্রাণে মারার সাহস করবে না।...শুনুন স্যার, এই মানুষটা—কিকিরা দি গ্রেট—একেবারে অপদার্থ নয়, যশিডিতে আমার অনেক মক্কেল আছে, তার মধ্যে একজন রয়েছে পুলিসের লোক—তেওয়ারীসাহেব। আমি তাঁকে বলে এসেছি। ভুজঙ্গ যদি বেশী চালাকি করার চেষ্টা করে, এবার আমি ওকে

ছাড়ব না।"

তারাপদ কিকিরার মুখ দেখতে লাগল। মানুষটির চোখ দেখলে বোঝা যায়— কিসের যেন এক জ্বালা তার চোখে ঝকঝক করে উঠেছে।

মাথার টুপিটা খুলে নিলেন কিকিরা, রোদে মাথা তেতে উঠেছে। বললেন, "ভুজঙ্গ এখনও তার আসল চাল চালে নি, স্যার। কাল সে আপনাদের ভেলকি দেখিয়ে ঘাবড়ে দেবার চেষ্টা করেছে। ধরুন আজ কিংবা আগামীকাল সে আসল চাল চালবে।"

"কী চাল?" তারাপদ জিজ্ঞেস করল।

কিকিরা বললেন, "আমার মনে হচ্ছে—চালটা আপনাকে নিয়ে। ভুজঙ্গ হয়ত আপনাকেই সব দিয়ে যেতে চায়, কিন্তু দিয়ে যাবার আগে সে আপনার সঙ্গে শর্ত করতে চাইবে। কিসের শর্ত আমি বুঝতে পারছি না। ভুজঙ্গ এত শঠ আর শয়তান যে তার চাল আগে থেকে বোঝা যায় না। তাই বলছি—আপনারা ধৈর্য ধরে থাকুন। দেখুন। ভয় পাবেন না। আমি এখানেই থাকব। আপনাদের খোঁজখবর করব। যদি কোনো বিপদে পড়েন ভুজঙ্গর আস্তাবলে রামবিলাস বলে যে কোচোয়ান আছে তাকে বলবেন। রামবিলাস আমার লোক। বুঝলেন? আমি কোথায় থাকব সে জানে।"

তারাপদরা অবাক হয়ে কিকিরার দিকে তাকিয়ে থাকল। চন্দন বলল, "ভুজঙ্গের বাড়িতে আপনার লোক কে কে আছে?"

কিকিরা যেন কতই লজ্জা পেয়েছেন, এমনভাবে হাসলেন। বললেন, "স্যার, আমার ধাতটাই হল ম্যাজিসিয়ানের, সব খেলাই ধীরেসুস্থে দেখাতে হয়, ঝট করে দেখাতে নেই। যথাসময়ে সবই দেখতে পাবেন।"

তারাপদ বলল, "কিকিরাবাবু, আপনি সাধুমামাকে চেনেন?"

কিকিরা কেমন করে হেসে বললেন, "চিনি।"

"কেমন চেনেন?"

"ভাল করেই চিনি।...দয়া করে আমায় এখন আর কিছু জিজ্ঞেস করবেন না। আপনারাও আর দেরী করবেন না। এবার ফিরতে শুরু করুন। ওই লোকটার ফেরার সময় হয়ে গেছে।...শুনুন, আর-একটা কথা বলে দিই। বাড়িতে এমনভাবে থাকবেন যেন ভুজঙ্গর ভেলকি দেখে আপনারা একেবারে ঘাবড়ে গিয়েছেন। কাউকে বুঝতে দেবেন না, আপনারা ব্যাপারটা সন্দেহ করছেন। ...আর হ্যাঁ, কাল আমি আপনাদের জন্যে একটা জিনিস নিয়ে আসব। আজকের রাত্রের খেলাটা আগে দেখে নিন, দেখুন ভুজঙ্গ কী করে।"

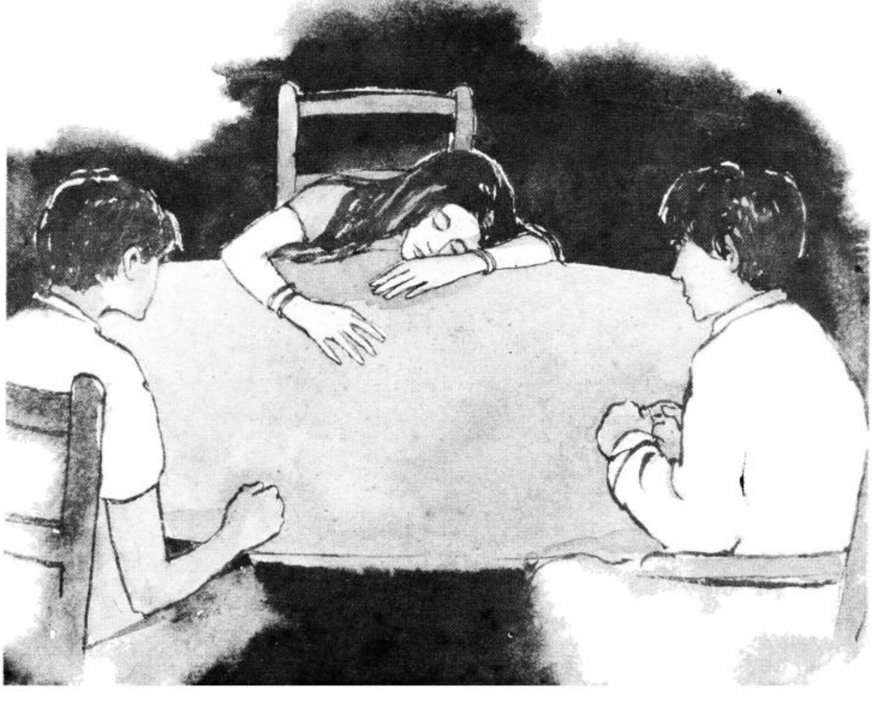

তারাপদরা উঠতে লাগল। "কাল কোথায় দেখা হবে?"

"কাল আপনারা ওই জঙ্গলের দিকে বেড়াতে যাবেন। আমি থাকব। একটা ভাঙা সাঁকো আছে, নালার মতন নদী, শুকনো; ওখানে থাকব।"

উঠে দাঁড়িয়ে চন্দন হেসে বলল, "স্যার, আজ আপনার একটা ইংলিশ শুনলাম না।"

কিকিরা হেসে বললেন, "শুনবেন, ঠিক সময়ে শুনবেন। এখন ভুজঙ্গ আমার ইংলিশ স্টীম করে দিচ্ছে। পেটে কিছু থাকছে না, স্যার। পেটে না থাকলে কি করে ইংলিশ হবে? ইংলিশ হল পেটারন্যাল ব্যাপার, পেট প্লাস ইন্টারন্যাল—সন্ধি করুন..."

চন্দন হো হো করে হেসে উঠল।

পাথরের আড়ালে থেকে বেরিয়ে দুজনেই রাস্তায় নেমে এল। হাত নাড়ল। কিকিরাও হাত তুললেন।

ফিরতে লাগল দুজনেই।

তারাপদ বলল, "চাঁদু, আমার মনে হচ্ছে—ভুজঙ্গর বেশ কিছু শত্রু আছে। তারা একটা দল করেছে। সেই দলে সাধুমামা, কিকিরা, রামবিলাস না কি নাম বললেন কিকিরা—ওরা আছে। আর ভুজঙ্গর দলে আছে তার চেলারা।

চন্দন বলল, "তাই মনে হয়।"

আরও খানিকটা এগিয়ে চন্দন ঘাড় ঘোরাল পিছনে। সাইকেলে-চড়া লোকটিকে দেখতে পেল না; কিকিরাকেও চোখে পড়ল না।

দুপুরটা ভালই কাটল। ভুজঙ্গভূষণের লোকজন আতিথ্যের ব্যাপারে কোনো কৃপণতা করল না। খাওয়া, শোওয়া, বাগানে ঘুরে বেড়ানো—কোনো দিকেই কারও কোনো বাধা নেই। কিন্তু তারাপদদের কেমন মনে হচ্ছিল, তারা যেন কাদের নজরে নজরে রয়েছে। সাধুমামার সঙ্গে বার দুই চোখাচুখি হয়েছে, হওয়া মাত্র সাধুমামা সরে গেছেন।

বিকেল পড়তে না পড়তেই ফুরিয়ে গেল। তারপর সন্ধে।

তারাপদরা তৈরি। আজ আবার সেই রহস্যময় ঘরে গিয়ে বসতে হবে। ভুজঙ্গ গতকালই জানিয়ে দিয়েছিলেন। আজ আবার কী দেখতে হবে কে জানে?

তারাপদ বরাবরই ভীতু ধরনের। বড় বেশী নিরীহ। কিকিরা যতই সাহস দিন; ভূত, প্রেত, আত্মা—বিশ্বাস করুক আর না করুক তারাপদ, তবু বিকেল থেকেই বেশ বিচলিত বোধ করতে লাগল। সন্ধের মুখে তার মুখ কেমন শুকিয়ে এল। তারাপদ চন্দনকে বলল, "চাঁদু, আমার এ-সব ভাল লাগে না। মিস্ট্রিই বল আর অলৌকিক ব্যাপার বল—কোনোটাই আমি সহ্য করতে পারি না।"

চন্দন বলল, "উপায় নেই ভাই, ভুজঙ্গর সব রকম খেলা দেখতেই হবে। লোকটার মনে কী আছে এখনও বোঝা যায় নি।"

তারাপদ বলল, "আজ আমি স্পষ্টই বলব, ভুজঙ্গকে বলে দেব—আত্মাটাত্মা আমি দেখতে চাই না। আপনার সঙ্গে খোলাখুলি কথা বলতে চাই। আপনার মুখ দেখতে চাই। হয় সাফসুফ কথা বলুন মশাই, না হয় ছেড়ে দিন, বাড়ি চলে যাই—আপনার সম্পত্তি আমি চাই না।"

দুই বন্ধুর কথাবার্তার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় এসে তাদের ডাকল। "এসো।"

সেই একই ঘর। কালকের মতনই অন্ধকার। বাতি যেটুকু জ্বলছে তাতে পাশের মানুষকেও আবছা দেখায়। ধুপধুনো গুগগুলের সেই রকম গন্ধ। তফাতের মধ্যে আজ একটা ছোট টেবিল রয়েছে গোল ধরনের, তার তিন দিকে চেয়ার।

তারাপদরা বসল।

ওরা বসার পর আচমকা কোথা থেকে ভারী গলায় স্তোত্র পাঠের মতন গানের সুর ভেসে এল। তারপর সেটা স্পষ্ট হল, যাকে বলে জলদগম্ভীর—সেই স্বরে কে যেন স্তোত্র পাঠ করতে লাগল। সংস্কৃত স্তোত্র। কে কোথায় গান করছে বোঝবার আগেই সেই গম্ভীর স্বর যেন কেমন অন্যমনস্ক করে ফেলল তারাপদকে।

স্তোত্রের মধ্যেই ভুজঙ্গভূষণ এলেন। কখন এলেন বোঝা গেল না। তাঁর বসার আসনেই বসলেন। মাথার ওপর সেই লাল আলো জ্বলে উঠল। ভুজঙ্গভূষণের পরনে রক্ত-গৈরিক বসন। একটা বড় রুদ্রাক্ষ ঝুলছে গলায়। মুখের ওপর সেই আবরণ।

স্তোত্র পাঠ বন্ধ হয়ে গেল।

ভুজঙ্গভূষণই কথা বললেন প্রথমে। বললেন, "তারাপদ, কাল তুমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলে। তোমার বন্ধুও ভয় পেয়েছিল। আজ ভয় পেয়ো না। যাঁরা তোমার আত্মীয়—মা, বাবা, বোন—"

"মা, বাবা, বোন—" তারাপদ চমকে উঠে বলল, গলার স্বর যেন বুজে আসছে।

"হ্যাঁ, তোমারই নিজের লোক। এঁদের আত্মা যখন আসেন তখন তোমার ভয় কী? এঁরা কেউ তোমার কোনো ক্ষতি করবেন না। অনেক দূর থেকে তাঁরা আসেন, আসতে তাঁদের কষ্টও হয়। এই মর্ত্যলোকে তাঁরা আসতে চান না। তবু আমরা যখন ডাকি, না এসে পারেন না। আজ আমি তোমার মাকে প্রথমে ডাকব।"

"মা?"

"তোমার মা আমার আত্মীয়া। আমরা তাকে ছেলেবেলায় বেণু বলে ডাকতাম। বলতে গেলে আমার বোনেরই মতো। আমি বেণুকে ডাকব।"

তারাপদর গায়ে কাঁটা দিল। মা! মা আসবে? কোন্ ছেলেবেলায় বাবাকে সে হারিয়েছে, স্কুলে পড়ার সময়, তারপর মা-ই ছিল তার সব। কত কষ্ট করে মা তাকে মানুষ করেছে, সেই মা আজ আসবে? তার কাছে? মা তা হলে আজও আছে, এ-জগতে নয়, অন্য জগতে, হয়ত স্বর্গে। মা কি তাকে দেখতে পায়?

তারাপদর বুকের মধ্যে কত দুঃখ যেন টনটন করে উঠল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "তোমার মা আসবে। এই ঘরেই আসবে। কিন্তু তুমি তাকে দেখতে পাবে না। আত্মা অদৃশ্য। ছায়ারূপে তাঁরা আসেন, চলে যান। মানুষের চোখ তাঁদের দেখতে পায় না। কোনো কোনো চিহ্ন তাঁরা রেখে যান, স্পর্শও দিয়ে যান—কিন্তু সব সময় নয়, কখনো কখনো, এ-সব কাজ করতে তাঁদের কষ্ট হয়।"

কথা শেষ করে ভুজঙ্গভূষণ পায়ের কাছে পড়ে থাকা ঘণ্টা তুলে নিয়ে বাজালেন।

ঘণ্টা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে ভুজঙ্গভূষণের পিঠের দিক থেকে ভেলভেটের পরদা সরিয়ে একটি মেয়ে এল।

ভাল করে দেখা যায় না মেয়েটিকে। তবু যেটুকু দেখা গেল তাতে মনে হল, কিশোরী মেয়ে, বছর পনেরো হয়ত হবে বয়েস, রোগা দেখতে, ধবধবে ফরসা রঙ, লম্বাটে মুখ, মাথার চুল এলো করা, পরনে ঘন কালো শাড়ি জামা। মেয়েটি এল। কিন্তু কিছুই দেখল না। কোনো দিকেই তাকাচ্ছিল না। ভুজঙ্গভূষণের পায়ের দিকে রাখা ঘণ্টাটা তুলে নিল। নিয়ে তারাপদদের কাছে এসে বসল। ঘণ্টাটা নীচে টেবিলের তলায় নামিয়ে রাখল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "তারাপদ, এই মেয়েটির মধ্যে দিয়ে তোমার মা আসবেন। ও হল আধার, ওর মধ্যে দিয়ে তোমার মাকে আসতে হবে। তোমরা দুজনে ওর হাতে হাত ছুঁয়ে বসো। পায়ে পা ছুঁইয়ে রাখবে। ও তোমাদের দেখিয়ে দেবে।"

তারাপদ কিছু ভাবতে পারছিল না। বিহ্বল বোধ করছিল।

চন্দনের মনে হল, এই হয়ত সেই মেয়ে—গতকাল যাকে সে এক লহমার জন্যে দোতলায় দেখেছিল।

ছোট গোল টেবিলের তিন দিকে তিন চেয়ার। মেয়েটি একটি চেয়ারে বসল। ইশারায় তারাপদদের চেয়ার সামান্য সরিয়ে নিতে বলল। চেয়ার সাজিয়ে নেবার পর দেখা গেল, টেবিলের ওপর হাত ছড়ালে তারাপদর একটা হাত মেয়েটির হাত ছোঁয়, অন্য হাত চন্দনের হাত ছোঁয়। চন্দনেরও সেই একই অবস্থা, তার বাঁ হাত তারাপদর হাত ছুঁয়ে রয়েছে, ডান হাত মেয়েটির হাত ছুঁয়েছে। এ যেন বাচ্চা বয়েসে সেই গোল হয়ে হাতে হাত ধরে খেলার মতন।

মেয়েটি তার পা দু পাশে বাড়িয়ে দিল। ইশারায় তারাপদদের বলল, ওদের এক একটা পা দিয়ে তার পা ছুঁয়ে থাকতে।

সামান্য বিব্রত বোধ করলেও তারাপদরা পা বাড়াল।

মেয়েটির পা বড় শক্ত শক্ত লাগল তারাপদর। অবশ্য বুড়ো আঙুলের কাছটায় আলগা করে ছুঁয়ে থাকল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "তুমি এবার মনে মনে তোমার মাকে ডাকো, তারাপদ। চোখ বন্ধ করে। একমনে। আমিও তাকে ডাকছি।" বলে ভুজঙ্গভূষণ তাঁর গম্ভীর গলায় কিসের যেন একটা মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন।

ঘরের সমস্ত আলো নিবে গেল। ঘুটঘুট করছে অন্ধকার।

তারাপদ চোখ বন্ধ করে মার কথা ভাবতে লাগল। তার ভয় হচ্ছিল; তবু সে মার কথা না ভেবে থাকতে পারল না। চন্দন প্রথমটায় চোখের পাতা খুলে রেখেছিল। কিন্তু চোখ খুলে রাখা না-রাখা সমান; দু চোখই যেন অন্ধ। কিছু দেখা যায় না; শুধু কালো আর কালো। চন্দনও চোখের পাতা বুজে ফেলল। তারাপদর মাকে সে দেখেছে, ভাল করেই জানত তাঁকে। চন্দনও তারাপদর মা-র কথা ভাবতে লাগল। আর মাঝে মাঝে অনুভব করছিল, তার একটা হাতের আঙুল মেয়েটির হাতের ওপর রাখা, অন্য হাতটি তারাপদর হাতের ওপর রয়েছে।

কতক্ষণ সময় যেন চলে গেল। কোনো শব্দ নেই। শেষে ভুজঙ্গভূষণ চাপা গলায় বললেন, "বেণু, তুমি এসেছ? তুমি কি এসেছ?"

কোনো সাড়াশব্দ নেই।

আবার চুপচাপ। আরও কিছু সময় গেল।

ভুজঙ্গভূষণ এবার আবার বললেন, "বেণু, তুমি এসেছ? আমরা তোমায় ডাকছি, তুমি এসেছ?"

হঠাৎ টেবিলের তলার দিকে মৃদু করে ঘণ্টা বেজে উঠল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "বেণু, তুমি যদি সত্যি সত্যি নিজে এসে থাকো—ঘণ্টাটা একবার বাজাও, বাজিয়ে থামিয়ে দাও, আবার বাজাও।"

ঘণ্টা সেইভাবেই বাজল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "তোমার ছেলেকে দেখতে পাচ্ছ? যদি পাও অন্যভাবে ঘণ্টা বাজাও। একটানা।"

এবারও সেই রকম বাজল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "তোমার ছেলেকে আমি এখানে এনেছি। তুমি তাকে বলো আমার ইচ্ছা মতন সে যেন চলে। আমি তার ভাল চাই।"

ঘণ্টাটা আস্তে আস্তে বাজল।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "তোমার সঙ্গে আর কেউ এসেছে বেণু? কে এসেছে?"

ঘণ্টা বাজল না।

ভুজঙ্গভূষণ কেমন আকুল স্বরে বললেন, "কে এসেছে বেণু? তোমার স্বামী?"

ঘণ্টা এবার জোরে বেজে উঠল।

তারাপদ সমস্ত কিছু ভুলে চিৎকার করে উঠল, "বাবা!"

বলার সঙ্গে সঙ্গে সে হাত টেনে নিয়েছিল। মেয়েটি কেমন শব্দ করে উঠল। যেন ঘুমের ঘোর থেকে চমকে উঠে শব্দ করেছে।

ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "কী হল? কী হল?"

বাতি জ্বলে উঠল। সেই মৃদু আলো। মেয়েটি টেবিলের ওপর মুখ রেখে পড়ে আছে। হাত ছড়ানো। থরথর করে কাঁপছে।

ভুজঙ্গভূষণ তারাপদকে বললেন, "কী করেছিলে তোমরা? বেণু চলে গেছে।"

তারাপদ ভয়ে ভয়ে বলল, "কিছু করি নি। হাত ছেড়ে দিয়েছিলাম।"

কঠিন গলায় ভুজঙ্গভূষণ বললেন, "মূর্খ!...সমস্ত বৃথা গেল।...যাও, তোমরা চলে যাও। ওকে ছুঁয়ো না। ধীরে ধীরে ও সুস্থ হয়ে উঠবে।"

তারাপদরা অপরাধীর মতন চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

(ক্রমশ)

সব ঘোড়াই কথা বলে

বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

গাবার জ্যেঠামশাই দুন্দুভি মুখুজ্যে হঠাৎ একদিন একটা ঘোড়া কিনে ফেললেন। গ্রামের শেষ প্রান্তে গো-হাটা, সেখানে বেদে বেদেনীরা মাঝে সাঝে ঘোড়া বিকোতে আসে, সেদিনও এসেছিল। দুন্দুভি মুখুজ্যে দেখলেন, ক্রিম ক্র্যাকার বিস্কুটের মতো রঙ, চমৎকার একটা ঘোড়া। এগিয়ে এসে দরদস্তুর করলেন, দরেও বনে গেল। ব্যাস, আর যায় কোথায়! করকরে টাকা বার করে ঘোড়াটা কিনে ফেললেন।

বেদে বলল, চলুন বাবুজী ঘোড়াটা আপনার মোকামে পৌঁছে দিয়ে আসি।

তারপর তড়াক করে সেই জোয়ান ছোকরা ঘোড়ায় চেপে বসল, পেছনে বসিয়ে নিল মুখুজ্যেকে। আহ্, ঘোড়া তো নয়, পক্ষীরাজের বাচ্চা। সামনে ঘাড়ের কেশর কাশ ফুলের মতো ঢল খাচ্ছে, পেছনে ফুলঝাড়ুর মতো লেজ, চিরিক চিরিক করে লাফিয়ে মুখুজ্যের পিঠে লাগছে, যেন ঘামাচি গেলে দিচ্ছে। আহ্, কি আরাম!

সারা বুক গর্বে ভেসে যাচ্ছিল মুখুজ্যের। ঘোড়া নিয়ে এসে উনি বাড়ির উঠোনে দাঁড়ালেন। অন্দর বাড়ি থেকে মেয়েরা, বউয়েরা, ঝিয়েরা বেরিয়ে এল। বেরিয়ে এল গাবার ছোটকাকু, বড়কাকু, বাবা।

—ওমা, ঘোড়া যে!

—তবে কি ভেবেছিলে, কুকুর? ঘোড়া না হলে এই গ্রামে আমাদের প্রেস্টিজ থাকে! তোমরা শাঁখ বাজাও গো মেয়েরা, ঘোড়াকে বরণ করে ঘরে তোল।

গাবাই সবচেয়ে বেশি খুশী। গা দিয়ে ওর ছিলিক ছিলিক করে খুশী ঝরে পড়তে শুরু করে। একবার এপাশে ছোটে, একবার ওপাশে। ঘোড়ার কান দুটো কেমন মোচার খোলের মতো। কুরকুরি কাটতে ইচ্ছে হয়। গলার নিচটা সাদা। গলা জড়িয়ে ধরে একবার দোল খেতে পারলে বেশ হত। কিন্তু সাহসে কুলোয় না, ঘোড়া রেগে গেলে কামড়ে দেয় কিনা জানা নেই।

হুটোপাটি করতে করতে এক সময় ওর নতুন মাস্টার মশাইয়ের কথা মনে পড়ল। মাস্টারমশাই নিখিলেশবাবু সারাজীবন মাস্টারি করে এখন অবসর জীবন যাপন করছিলেন। গাবা পর পর তিন বছর ক্লাস সিক্সেই ফেল করায় দুন্দুভি মুখুজ্যে ওঁকে চিঠি দিয়ে কলকাতা থেকে আনিয়ে নিয়েছিলেন। মাইনে-পত্র অবশ্য কম, তবে খাওয়া থাকা ফ্রি, আর গাবাকে যদি পাশ করিয়ে দিতে পারেন তাহলে বিঘা চারেক জমি লিখে দেবেন কথা আছে। টিনের সুটকেশ আর বগলদাবা বিছানা নিয়ে

ভদ্রলোক মুখুজ্যে বাড়ির বাইরের একটা ঘরে আস্তানা গেড়েছিলেন।

বাড়িতে ঘোড়া আনা হয়েছে, চারপাশে হৈচৈ। নিখিলেশবাবু একবার একটু উঁকি মেরে দেখে এলেন। তেমন উৎসাহ পেলেন না। তারপর সময় নষ্ট করা হচ্ছে মনে করে 'সীতার বনবাস' খানা খুলে বসলেন। এমন সময় গাবাচরণ লাফাতে লাফাতে ঘরে ঢুকে নিখিলেশবাবুকে জড়িয়ে ধরে বললো, "মাস্টারমশাই ঘোড়া এসেছে, ঘোড়া।"

নিখিলেশবাবু বই বন্ধ করলেন।

"কি সুন্দর একটা ঘোড়া এনেছে জ্যেঠামশাই, দেখেছেন?"

"দেখেছি বই কি! খুব সুন্দর।"

গাবা আরো গায়ে গায়ে সেঁটে বসে বলে, "আচ্ছা মাস্টারমশাই?"

"কি বাবা গাবা?" বিরক্তি মিশিয়ে উত্তর দেন নিখিলেশবাবু।

"একটা কথা জিজ্ঞেস করব? রাগ করবেন না তো?"

"ছি ছি, রাগ করব কেন, বলো?"

"ঘোড়া কথা বলে না?"

"বলে বই কি বাবা, বলাতে জানলেই বলে।"

গাবা চনমন করে উঠে বসে। "আমাদের ঘোড়াও তা হলে কথা বলবে?"

"আলবৎ বলবে।" নিখিলেশবাবু একটা হাই কাটেন। "ঘোড়া তো তবু উচ্চ শ্রেণীর জীব, কত গাধার মুখে আমি কথা ফোটালাম।"

এমন সময় দুন্দুভি মুখুজ্যে দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ মাস্টারের মুখে ঘোড়ার কথা শুনে থমকে দাঁড়ালেন। "কি মাস্টারমশাই, কেমন দেখলেন আমাদের ঘোড়া?"

নিখিলেশবাবু ধড়মড় করে উঠে দাঁড়ান। "আজ্ঞে খাসা, খাস মুলতানী বংশধর।"

"তবেই বলুন। আমার পছন্দ আছে কি না দেখিয়ে দিলাম তো!"

"তা আর বলতে!" নিখিলেশবাবু মাথা ঝাঁকান, "ভারী চমৎকার আপনার পছন্দ।"

এমন সময় গাবা বলে, "জানো জেঠু, মাস্টারমশাই না ঘোড়াকেও কথা বলাতে পারেন।"

"বটে বটে!"

মহা বিপাকে পড়ে যান নিখিলেশবাবু, মাথা চুলকোতে চুলকোতে বলেন, "কথা বলানো মানে, এক কালে ঘোড়ার সাইকোলজি নিয়ে কিছু পড়াশুনা করেছিলাম। তখন ঘোড়াকে যদি বলতাম, ওঠ, অমনি ঘোড়া উঠে দাঁড়াত। যদি বলতাম, বোস, অমনি বসে পড়ত।"

দুন্দুভি মুখুজ্যে খুশীতে আটখানা, "বটে বটে?"

নিখিলেশবাবু সামলাবার চেষ্টা করেন, "তবে এখন কি জানেন, এখন আমি নিজেই একটা বুড়ো ঘোড়া, রাতদিন কেবল জাবর কাটি।"

গাবা সরলভাবে আঙুল চুষছিল, বলল, "তাহলে মাস্টারমশাই আপনি ঘোড়ায় চড়তেও জানেন?"

নিখিলেশবাবুর ইচ্ছে হল ঠাস করে ছেলেটার গালে একটা চড় কষিয়ে দেন, কিন্তু নিজের জ্ঞানগম্যির ওপর বাড়ির লোকের শ্রদ্ধা বাড়াবার জন্য অদ্ভুত চোখে হেসে ওঠা ছাড়া উপায় রইল না। ভাবখানা এরকম, যেন কত পাগলা ঘোড়াকে বশ মানালাম, আর এটুকু পারব না। মাস্টার হওয়া কি মুখের কথা।

দুন্দুভি মুখুজ্যে আরো খুশী। এত দিনে একজন মাস্টারের মতো মাস্টার পাওয়া গেছে। মাস্টারের নামে আধ সের করে দুধ বাড়িয়ে দিলেন তিনি।

পর দিন ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ির বাইরে হৈচৈ। কী ব্যাপার? না, ঘোড়া নিয়ে কসরত শুরু হয়ে গেছে। দুন্দুভি মুখুজ্যের হাতে চাবুক, মুখুজ্যেকে ঘিরে জনা চার-পাঁচ লোক। ঘোড়া বেগরবাঁই শুরু করেছে। ঘোড়ার লাগাম হাতে যেই কেউ উঠতে যায়, অমনি ঘোড়া সামনের পা দুটো তুলে চিঁহিহি চিঁহিহি...সে কি চিৎকার।

যাঃবাবা, এরকম তো করার কথা ছিল না। কালও তো দিব্যি বেদেরা ঘোড়ার পিঠে চড়েছে। মুখুজ্যেমশাইকে পিঠে চড়িয়ে বাড়ি অবদি টুকুস টুকুস করে হেঁটে এসেছে। তখন তো ঘোড়া গোলমাল করেনি।

দুন্দুভি মুখুজ্যে এগিয়ে এসে ঘোড়ার পিঠে হাত বোলান, "চটছিস কেন বাবা, এখানে তো জামাই আদরেই থাকবি। যা খেতে চাস, খেতে পাবি। শুধু দয়া করে একটু পিঠে চড়তে দে। দিবি না? এই, এই ঘোড়া?"

গাবা এই সব দৃশ্য ফৃশ্য দেখে হাবা হয়ে গিয়েছিল। ছোট কাকুকে আর একটু হলে চেপটেই দিয়েছিল আর কি! পা দুটো সামনে তুলে ঘোড়াটা যখন লম্বা হয়ে দাঁড়াল, তখন দু হাতে ও চোখ চেপে চিৎকার করে উঠেছিল।

দুন্দুভি মুখুজ্যে বুঝতেই পারছিলেন না, গণ্ডগোলটা কোথায়! কাউকেই ও পিঠে তুলে নিতে চাইছে না কেন! আচ্ছা বেয়াদপ তো! এমনি কিন্তু বেশ শান্ত শিষ্ট, যেন ভাজা মাছটাও উলটে খেতে জানে না। কিন্তু পিঠে চড়তে গেলেই ধ্যাস্টামি।

অবশেষে হতাশ হয়ে উনি মাস্টারমশাইয়ের তলব করলেন, "মাস্টার কোথায় রে?"

গাবা উত্তর করল, 'ঘুমুচ্ছে জ্যেঠামশাই।'

"এই বেলা অবদি ঘুমুচ্ছে। যা, ডেকে নিয়ে আয়। ঘোড়াকে কি করে শায়েস্তা করতে হয় এবার দেখাচ্ছি।"

সবাই কেমন হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকে। গাবার বাবা বলেন, "আমরাই যাকে বাগ মানাতে পারছি না, বুড়ো মাস্টারমশাই তাকে কী করবে। নিরীহ গোবেচারা মানুষ।"

গাবা ততক্ষণে সাঁ করে ছুটে গিয়ে মাস্টারমশাইয়ের কাছে হাজির।

"মাস্টারমশাই, ও মাস্টারমশাই!"

"কি রে গাবা, কি হয়েছে?"

"ঘোড়াটা বেয়াদপি করছে মাস্টারমশাই। বাবা আপনাকে ডাকছেন।"

নিখিলেশবাবুর বুক শুকিয়ে গেল, "বেয়াদপি করছে মানে?"

"কি জানি মাস্টারমশাই, কেউ ওর পিঠে উঠতে পারছে না। উঠতে গেলেই ঘোড়া সামনের দু পা তুলে লম্বা হয়ে যাচ্ছে।"

নিখিলেশবাবুর পরনে একটা ধুতি, খালি গা। গেঞ্জিটা গায়ে পরে নিতে নিতে বিড়বিড় করে বললেন, "ঘোড়া কথা শুনছে না, তা আমি কি করব?"

গাবা বলল, "আপনি ইচ্ছে করলেই ঘোড়াটাকে ঠিক

করে দিতে পারেন। আসুন না মাস্টারমশাই।"

"আমি কি ঘোড়ার মাস্টার নাকি! যত্তোসব।"

কিন্তু গাবা নাছোড়বান্দা। মাস্টারমশাইকে চেপে ধরল, "চলুন না।"

"এই ছাড় ছাড়। আচ্ছা আমি যাচ্ছি, ছাড়।"

নিখিলেশবাবুর কাঁপুনি শুরু হল। সত্যি সত্যি ঘোড়াকে বশ মানাতে হবে নাকি! ঘোড়াটার মাথায় কোন গণ্ডগোল নেই তো? কি কুক্ষণেই যে ঘোড়া নিয়ে অত কথা বলতে গিয়েছিলাম। শেষ পর্যন্ত পেটের দায়ে ঘোড়ার মাস্টারি করা, চাকরিটা বুঝি সত্যি সত্যি এবার গেল।

কি আর করেন, নিখিলেশবাবু কাঁপতে কাঁপতে গাবার সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়ালেন।

"এই যে মাস্টারমশাই, দেখুন দেখি, ঘোড়াটা কি ঝামেলা শুরু করেছে সকাল থেকে।"

"কি করেছে?" বুকটাকে সাহসে বাঁধতে চেষ্টা করলেন নিখিলেশবাবু। তারপর সন্দেহজনক চোখে ঘোড়াটাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে শুরু করলেন। দিব্যি শান্তশিষ্ট চেহারা। ডাইনে বাঁয়ে একটু আধটু মাঝে মাঝে যা লেজ নাড়াচ্ছে। বললেন, "নাহ্, ঘোড়া তো ঠিকই আছে। আপনারাই হয়তো উঠতে গিয়ে গোলমাল করছেন।"

"আপনি একবার উঠে দেখুন না মাস্টারমশাই।"

"আমি!" নিখিলেশবাবুর পেটের মধ্যে কেউ যেন কোঁৎ করে একটা ঘুঁষি মারল।" ওসব ঘোড়ায় চড়াফরা অনেককাল আমি ছেড়ে দিয়েছি। আপনারাই কেউ কেউ চড়ুন, আমি দেখি।"

দুন্দুভি মুখুজ্যে এগিয়ে এলেন, "ঠিক আছে, আমিই চড়ছি। তোমরা কেউ ওর গলার কাছটা চেপে ধরে ঝুলে থেকো তো! ও যেন আর দাঁড়াতে না পারে।"

হাতে চাবুক দোলাতে দোলাতে আলতো করে পিঠে একটু ঘা মারলেন মুখুজ্যেমশাই। ঘোড়া নির্বিকার।

"ঠিক আছে, এবার আপনি উঠুন।" নিখিলেশবাবু পেছন থেকে সাহস জোগাবার চেষ্টা করলেন। বেয়াদপি করলে সটাস সটাস করে চাবুক চালাবেন। বলতে বলতে বেশ কয়েক হাত তফাতে সরে এলেন উনি। বলা যায় না, জন্তু তো! দৌড়ে এসে নিখিলেশবাবুকেই যে ঢুঁশ কষিয়ে দেবে না, বিশ্বাস কি!

মুখুজ্যেমশাই ততক্ষণে রেকাবে পা রেখেছেন একটা। অন্য পা লাফিয়ে ঘোড়ার পিঠে ছুঁড়ে দেবার আগে করুণ চোখে একবার মাস্টারমশাইয়ের দিকে তাকালেন। যেন, মাস্টারমশাই, আপনিই এখন ভরসা। তারপর জয় মা দুর্গা বলে যেই উনি ঘোড়ার পিঠে লাফ দিয়েছেন অমনি সেই আগের দৃশ্য। চিঁহিহি চিঁহিহি ...সটান সামনের দু পা আকাশে তুলে একেবারে মানুষের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়া। আর মুখুজ্যেমশাই সেই চোট সামলাতে না পেরে ছিটকে গড়িয়ে এলেন কয়েক হাত দূরে।

"উফ, মাগো, বাবাগো, মলাম গো, গেলাম গো।"

নিখিলেশবাবুর চোখ চড়ক গাছ। একি ঘোড়ারে বাবা, এ যে উঠে দাঁড়ায়। ঘোড়া কখনো এরকম উঠে দাঁড়াতে পারে উনি চোখে না দেখলে বিশ্বাসই করতেন না।

দুন্দুভি মুখুজ্যেকে সবাই এসে তুলে ধরল। ভাগ্যিস তেমন জোরে চোট লাগেনি।

মুখুজ্যে চেঁচাতে চেঁচাতে বললেন, "দেখলেন তো মাস্টারমশাই, কাণ্ডটা দেখলেন। কাল কিন্তু দিব্যি ও ভালো মানুষ ছিল। আজ ঘুম থেকে উঠেই কেমন গণ্ডগোল শুরু করেছে দেখুন।"

"রাতে ভালো করে ঘুম হয়নি বোধ হয়। মশাটশা কামড়ায় নি তো ওকে?"

"ঘুম না হলেই যদি এমন করে, তা হলে আমাদের চলে কি করে! ঘোড়া কিনেছি, সকাল বিকাল একটু পিঠে চড়ে বেড়াব, তা যদি না হয়—"

"তা হলে না হয় আর এক কাজ করুন, বেদেদের কাছে আবার ওকে ফেরত দিয়ে আসুন। এসব দুষ্টু জানোয়ার না রাখাই ভালো।"

দুন্দুভি মুখুজ্যে প্রায় কাঁদো কাঁদো। "আপনি একবার চেষ্টা করে দেখুন না মাস্টারমশাই, এত সাধ করে কিনলাম।"

গাবার বাবা-কাকাও ছেঁকে ধরলেন মাস্টারমশাইকে, "দেখুন না মাস্টারমশাই একটু চেষ্টা করে, আপনাদের মতো জ্ঞানীগুণী লোক যদি না পারেন তাহলে আর বলার কিছু নেই।"

চাকরি আর সম্মান রাখতে হলে এর পর আর না করা চলে না। যা থাকে কপালে! নিখিলেশবাবু ভাবলেন, ঘোড়ার হাতেই ওঁর মৃত্যুযোগ লেখা আছে, বিধির বিধান তো খণ্ডাবার উপায় নেই, কি আর করা যায়।

দু পা এক পা করে এগিয়ে এসে ঘোড়ার পিঠে হাত ছোঁয়ালেন উনি। কে বলবে এই ঘোড়াই চিঁহিহি করে অমনভাবে দাঁড়িয়ে ওঠে। এখন তো দিব্যি শান্ত। চোখে ওর এতটুকু দুষ্টুমি নেই। ঘোড়ার লাগাম ধরে একটু নেড়েচেড়ে দেখলেন। তারপর অসহায় চোখে চারপাশে একবার তাকালেন।

গাবা পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল, "আপনি উঠে পড়ুন মাস্টারমশাই, উঠে পড়ুন।"

নিখিলেশবাবু ভীষণ চটে গিয়ে ধমকে উঠলেন, "চোপ! এ সময় চেঁচাতে নেই।" ঘোড়া একবার ঘাড় ফিরিয়ে নিখিলেশবাবুকে দেখে নিল।

ফলে আরো বুকের ভিতর গুড়গুড় করে উঠল। কিন্তু উপায় নেই, ধুতিটাকে মালকোচা মেরে গুটিয়ে নিলেন। তারপর ভয়ে ভয়ে রেকাবে একটা পা তুলে দিলেন। বাপরে এত উঁচু, উঠব কি করে!

"দেখবেন মাস্টারমশাই, পেছনের পায়ের দিকে কিন্তু সাবধান। একবার আপনাকে পায়ের রেঞ্জে পেলে ভুঁড়ি ফাঁসিয়ে দেবে।"

কিন্তু কোন উপদেশই যেন কানে ঢুকছিল না নিখিলেশবাবুর। চোখ বুজে একবার ভগবানের কাছে প্রার্থনা করে নিলেন। তারপর অদ্ভুত এক কায়দায় ঘোড়ার পিঠে শুয়ে পড়ে সাঁতরাতে শুরু করলেন। দু হাতের মুঠোর মধ্যে তখন ঘোড়ার লম্বা লম্বা কেশর।

—চিঁহিহি......চিঁহা চিঁহা চিঁহা......ঘোড়া সটান লাফিয়ে উঠল সামনে। কিন্তু প্রাণপণে কেশর চেপে রেখেছেন নিখিলেশবাবু। পা দুটো বেসামাল হয়ে জিনের দু পাশে ঝুলছে। ঝুলতে ঝুলতেই ঘোড়ার পেটে দু পাশে দুবার লাথ লেগে গেল।

ঘোড়ার সামনের পা দুটো ধপাস করে মাটিতে আছড়ে পড়ল। এবার লাফিয়ে উঠল পিছনের পা।

ঘোড়া যা ইচ্ছা করুক, শক্ত করে ঘোড়ার কেশর আঁকড়ে রইলেন নিখিলেশবাবু। মরতে যদি হয় ঐভাবেই উনি মরবেন।

চারপাশ থেকে সবাই তখন চেঁচাতে শুরু করেছে, "লাগাম চেপে ধরুন মাস্টারমশাই, সাবধান, লাগাম চেপে ধরুন।"

কিন্তু কোন কথাই কানে ঢুকছিল না তখন। ঘোড়ার পেছনের পা দুটোও নেমে এল নিচে। তারপর এলোপাথারি আরো কয়েকটা লাফ। তারপর কি আশ্চর্য, চিঁহা চিঁহা চিঁহা...ঘোড়া মাঠ ছাড়িয়ে ধানবনের দিকে ছুটতে শুরু করল।

নিখিলেশবাবু বুঝতে পারছিলেন না, উনি ঘোড়ার উপরই বসে আছেন, না, ঘোড়াটা ওঁকে আকাশে ছুঁড়ে দিয়েছে! উনি আকাশে উড়ে বেড়াচ্ছেন! যা থাকে কপালে, একটু একটু করে উনি লাগাম টেনে ধরবার চেষ্টা করলেন। সামনে খানা, খন্দ, জঙ্গল কিছুই মানছে না ঘোড়া, ছুটছে তো ছুটছেই।

আরো কিছুক্ষণ কাটার পর নিখিলেশবাবু বুঝতে পারলেন, ঘোড়ার পেছন পেছন তখন অনেকেই ছুটতে শুরু করেছে। মাঠে যে সব চাষীরা কাজ করছিল তারাও অবস্থা বুঝে দে-ছুট। কোত্থেকে দুটো নেড়ি কুকুর জুটে গেল। ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ওরাও ছুটতে শুরু করেছে। সে এক এলাহী ব্যাপার। কিন্তু ততক্ষণে অবস্থাটা মোটামুটি সামলে নিয়েছেন নিখিলেশবাবু। এতক্ষণ যেন শুয়ে শুয়ে চলছিলেন, এবার একটু একটু করে উঠে বসলেন। লাগামটা এখন হাতের মুঠোয়। ঘোড়ার লাফানির তালে তালে হাত-পাগুলো যেন ওঁর খুলে খুলে যাচ্ছে। যাক্, তবু তো উনি ঘোড়ায় চড়ে ছুটছেন।

ছুটতে ছুটতে হঠাৎ একটা ডোবা মতো চোখে পড়ল। ডোবার উপরই ঝাঁপিয়ে পড়বে নাকি! এই সেরেছে। এ যে একেবারে পাঁকে ভর্তি। আবার বুক শুকিয়ে এল নিখিলেশবাবুর। শক্ত করে লাগামটা উনি টেনে ধরতেই ঘোড়া একেবারে ডেড স্টপ। আর এ সময় ওঁর হাতে লাগাম ছাড়া কিছুই নেই। নিখিলেশবাবু বুঝতে পারলেন ঘোড়ার মাথা ডিঙিয়ে উনি সামনের দিকে উড়ে চলেছেন। ঘোড়ার ছুটে চলার গতি ঘোড়া বেশ সামলে নিয়েছে, কিন্তু ওঁর হাতে এখন কেশর ধরা নেই, উনি একটা উড়ন্ত চাকির মতো গাবুং করে একেবারে ডোবার মাঝখানে।

চারপাশ থেকে লোকজন সব ছুটে আসতে যেটুকু সময়! "কি হল মাস্টারমশাই, কি হল?"

ঘোড়াটা দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁফাচ্ছে।

নিখিলেশবাবু পাঁকের মধ্যে। সর্বাঙ্গে কাদা মেখে অনেক কষ্টে উনি পারে উঠলেন।

"কোথাও চোট লাগে নি তো মাস্টারমশাই?"

নিখিলেশবাবুর ইচ্ছে হচ্ছিল দুন্দুভি মুখুজ্যের টাকে এই কাদা জল এক বালতি ঢেলে দিতে। কিন্তু চাকরি করতে এসে মাথা নিচু করেই থাকতে হয়। হেসে বললেন, "কিচ্ছু না। কিচ্ছু না। ঘোড়া আপনাদের ঠিক হয়ে গেছে, নিয়ে যান। এবার থেকে ও ঠিক কথা শুনবে।"

ঘোড়ার কী খেয়াল হল, ঘোড়া আপন মনে হেসে উঠল, চিঁহা চিঁহা চিঁহা।

ছবি এঁকেছেন ॥ মদন সরকার

উপন্যাস

রাজা হওয়ার ঝকমারি

বিমল মিত্র

আগে যা ঘটেছে

কোম্বাগড়ের মহারাজা কন্দর্পনারায়ণ বানপ্রস্থে যাবেন। যাবার আগে দুই ছেলে কীর্তিনারায়ণ আর কান্তিনারায়ণের মধ্যে তাঁর সমস্ত সম্পত্তি তিনি আধাআধি ভাগ করে দিয়ে যেতে চান। মরকত-মণিটিকে কেটে দু-ভাগ করা যায় না; তাই সেটিকে দেবেন এমন লোককে, যে সর্বশ্রেষ্ঠ নির্বোধ। আর শ্রেষ্ঠ নির্বোধকে যে খুঁজে বার করতে পারবে, সেই রাজপুত্রই বসবে সিংহাসনে। রাজা বানপ্রস্থে গেলেন, মন্ত্রীমশাই শূন্য-সিংহাসনে রাজমুকুট বসিয়ে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন, আর দুই রাজপুত্র বার হলেন নির্বোধ খুঁজতে। ছ মাসের মধ্যে বোকা খুঁজে বার করা চাই। কিন্তু সারা রাজ্য ঢুঁড়েও তেমন বোকা পাওয়া যাচ্ছে না। তাই বনবাসী মহারাজার কাছে লোক পাঠানো হল। তিনি বললেন, কোম্বাগড়ে যদি বোকা খুঁজে না-ই পাওয়া যায়, তবে রাজপুত্রেরা বরং জম্বুদ্বীপে যাক। তা দুই রাজপুত্র সেই অনুযায়ী দুই জাহাজে করে জম্বুদ্বীপে গেলেন। ছোট রাজপুত্র কান্তিনারায়ণ ও তার ভৃত্য মধু সেখানে এক কলাওয়ালার দেখা পায়। বিনা-পয়সায় সে তার কলার কাঁদি বিলিয়ে দিতে চাইছে দেখে কান্তিনারায়ণ ভাবে, লোকটা ভারী বোকা। কিন্তু কলা নিয়ে তারা দু-চার পা এগোবার পরেই কলাওয়ালা কোতোয়ালকে বলে যে, তারা তার কলার কাঁদি চুরি করে পালাচ্ছে। বাস, কোতোয়ালও অমনি তাদের কয়েদখানায় পুরে দিল। ওদিকে, বড় রাজপুত্র কীর্তিনারায়ণও জম্বুদ্বীপে এসে বোকা খুঁজছিল। সেখানে, এক হাঁড়ি-কলসির দোকানের মালিক নিজেকে 'বোকা' বলে ঘোষণা করায়, ভৃত্য দাশরথির অনুরোধে, কীর্তিনারায়ণ তাকে দেখতে চলল। তারপর—

॥ ৭ ॥

কিন্তু রাস্তায় বেরোতে গিয়েও বেরোন হলো না। থমকে দাঁড়িয়ে খানিকক্ষণ ভেবে নিলে কীর্তিনারায়ণ। তারপর বললে—দেখ দাশরথি, ভাবছি আমার এই জামা-কাপড় বদলে নেওয়া ভালো। এটা বদলে একটা ময়লা জামা-কাপড় পরে সেখানে যাই—

দাশরথি বুঝতে পারলে না বড়-রাজকুমারের কথাটা।

জিজ্ঞেস করলে—কেন বড়দাদাবাবু? ময়লা জামা-কাপড় পরে কেন যাবে? রাজার ছেলে হয়ে কি ময়লা জামা-কাপড় পরে রাস্তায় বেরোন ভালো?

কীর্তিনারায়ণ বললে—দেখ না তুমি, আমি কী করি! আমার একটা মতলব আছে—

দাশরথি জিজ্ঞেস করলে—কী মতলব?

—সে তোমায় আমি এখন বলবো না।

বলে জামা-কাপড় বদলে নিলে। মাথার পাগড়িটা খুলে রেখে দিলে। তারপর পায়ের নাগরা জুতো-জোড়াও বদলে নিয়ে একজোড়া সাধারণ জুতো পায়ে গলিয়ে নিলে।

বড়-দাদাবাবুর পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে দাশরথির ভালো লাগলো না। রাজকুমার হয়ে এ-রকম জামা-কাপড় পরে রাস্তায় বেরোন কি ভালো?

কীর্তিনারায়ণ সে-কথায় কান না দিয়ে সোজা রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো। জম্বুদ্বীপ দেশটা কীর্তির ভালো লেগেছে। বেশ-খোলা-মেলা। আকাশ বেশ নীল কিন্তু লোকগুলো যেন কেমন-কেমন। কেউ কারোর ভালো দেখতে পারে না। এই ক'দিনেই সে লোকগুলোকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনে নিয়েছে। এখানে লোকে কাজ যত করে তার চেয়ে কথা বলে বেশি, উপদেশ দেয় যত লোক, সে উপদেশ শোনে তার চেয়ে কম লোক। আর যেচে সদুপদেশ দেওয়ার লোকের সংখ্যা এ-দেশে এত বেশি যে তাদের ছোঁয়াচ বাচিয়ে চলাই দায়। প্রথম দিন থেকেই তারা কীর্তিকে নতুন মানুষ পেয়ে উপদেশ দেওয়া সুরু করেছে। কেউ বলেছে—সারা দিন ঘরে বসে থাকেন কেন মশাই, একটু হাঁটাহাঁটি করুন। হাঁটলে স্বাস্থ্যটা ভালো থাকবে।

আবার কেউ বলেছে—আপনি নতুন এসেছেন বুঝি? তাহলে আপনাকে আগে থেকেই সাবধান করে দিই মশাই। এখানকার লোকের সঙ্গে বেশি মেলা-মেশা করবেন না, এ-দেশের লোকরা খুব সুবিধের নয়—

নিজের দেশের লোক হয়ে নিজের দেশের লোকেদেরই নিন্দে করা—এটা বড় অবাক লেগেছে কীর্তির কাছে। ভালোই হলো, এদেশে নিশ্চয় তার উদ্দেশ্য সিদ্ধি হবে। এদের মধ্যে নিশ্চয়ই একজন শ্রেষ্ঠ বোকা খুঁজে পাওয়া যাবে! এ ক'দিন এখানে এসে তার ধারণা হয়েছে যে এখানে ভীষণ বুদ্ধিমান চালাক লোক যেমন অসংখ্য আছে, তেমনি আবার ভীষণ ধাঁড়িবাজ লোকও আছে অসংখ্য। এরা বাইরে বেশির ভাগ লোকই নিপাট নিরীহ গোবেচারা ভালোমানুষ সেজে থাকে, ভেতরের রূপটা তাদের অন্য রকম।

এই হাঁড়ির দোকানের লোকটা কী-রকম কে জানে! নিজের মুখে নিজেকে বোকা বলে ঘোষণা করেছে। এ-রকম বড় কম দেখা যায়। নিশ্চয় এর পেছনে কোনও মতলব আছে। তা দেখাই যাক্ পরীক্ষা করে কী তার মতলব!

একটা রাস্তার মোড়ে এসে কীর্তি জিজ্ঞেস করলে—সে লোকটার দোকানটা কোন দিকে দাশরথি, আমাকে

দেখিয়ে দাও তো?

আরো একটু আগে ডেকে নিয়ে দাশরথি দেখালে—ওই যে, ওই দোকানটা। ওই যে থাক্-থাক্ একটার পর একটা মাটির হাঁড়ি কলসী সাজানো রয়েছে—

কীর্তি দেখতে পেলে। তারপর দাশরথিকে বললে—তুমি এখানে দাঁড়িয়ে থাকো, আমি নিজে লোকটার সঙ্গে গিয়ে দেখা করে একটু পরখ করে আসি—

তারপর জিজ্ঞেস করলে—কী নাম যেন বললে লোকটার?

দাশরথি মনে করিয়ে দিলে—শ্রীবিনোদ দাস।

বিনোদ দাস! ঠিক আছে। নামটা জেনে রাখা ভালো।

দাশরথি সেইখানেই একটু আড়াল দেখে একটা জায়গায় দাঁড়িয়ে রইল। আর কীর্তি সোজা এদিক-ওদিক দুদিকে দেখতে দেখতে সেই মাটির হাঁড়ি-কুড়ির দোকানটার দিকে চেয়ে রইল। তারপর দোকানের সামনে গিয়ে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা, এখানে শ্রীবিনোদভূষণ দাসের দোকান কোন্‌টা?

বিনোদ দাস এগিয়ে এসে দাঁড়ালো।

জিজ্ঞেস করলে—কেন বলুন তো? আপনি কী চান?

কীর্তি বললে—আমি একটা ভালো মাটির হাঁড়ি চাই, ভাত রাঁধবার হাড়ি—

দোকানদার বিনোদ দাস বললে—তা হাঁড়ি তো আছে আমার কাছে। কীরকম মাপের হাঁড়ি চাই, বলুন?

কীর্তি বললে—না, আমি বিনোদ দাসের দোকান থেকে হাঁড়ি কিনবো, আমাকে লোকে বিনোদ দাস ছাড়া অন্য দোকানে হাঁড়ি কিনতে মানা করে দিয়েছে। বলেছে বিনোদ দাস খুব খাঁটি লোক, তার দরও সস্তা, তার হাঁড়িও ভালো—আমি আপনার দোকান থেকে কিনবো না—

বিনোদ দাস বললে—আরে কী মুশকিল, আপনাকে নিয়ে তো সত্যিই মহা মুশকিলে পড়ে গেলাম দেখছি। আমারই নাম তো বিনোদ দাস—আপনি বসুন, ওরকম রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে থাকবেন না। ভেতরে এসে এই মাদুরের ওপর ছায়ায় একটু বসুন, বসে একটু জিরিয়ে নিন। আর জল তেষ্টা যদি পেয়ে থাকে তো বলুন, আখের গুড়ের বাতাসা দাঁতে চিবিয়ে এক ঘটি ঠাণ্ডা জল খান্—

কীর্তি বললে—না না, জল তেষ্টা পায়নি আমার, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আপনার নাম যখন বিনোদ দাস তখন আমার দুর্ভাবনা চুকে গেল। তা আপনি আমাকে ভালো মজবুত দেখে একটা তিজেল্ হাঁড়ি দিন তো। যাতে চার সেরের মত চাল ধরে—

বিনোদ দাস মশাই ভেতর থেকে বেছে বেছে একটা হাঁড়ি নিয়ে এল।

কীর্তি হাঁড়িটা নিয়ে বললে—এটা মজবুত হাঁড়ি তো? চার সেরের মত চাল ধরবে তো?

বিনোদ দাস মশাই বললে—নিশ্চয়ই, আমি যখন ভাল

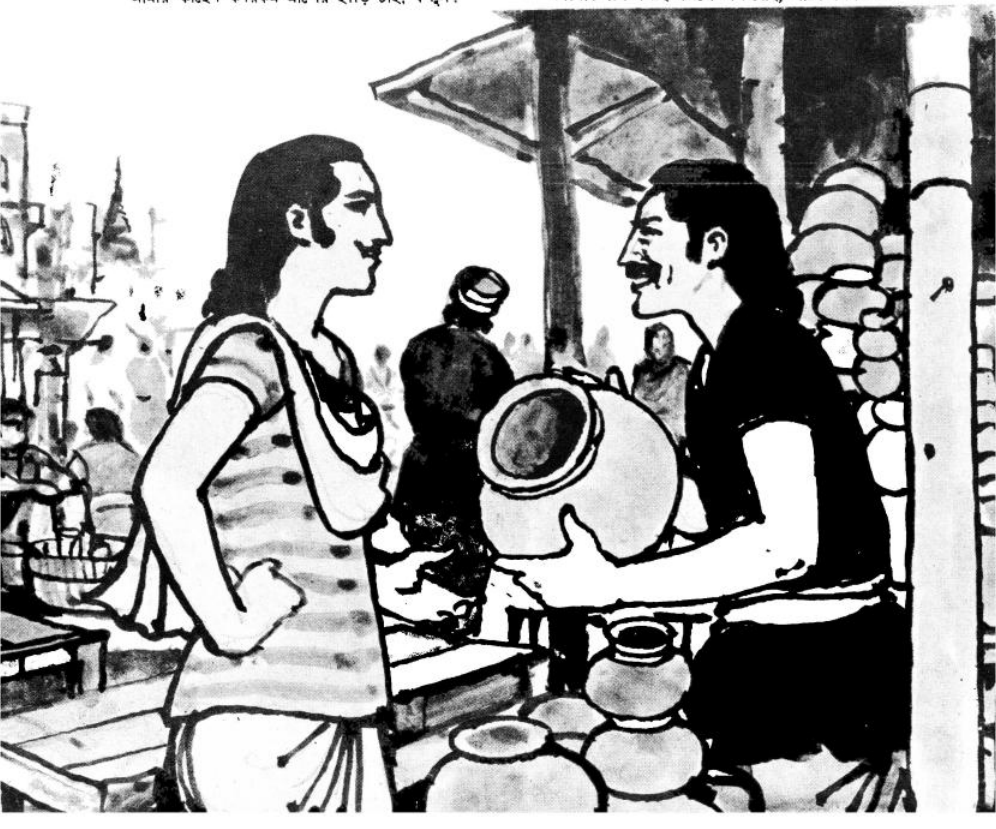

বলছি তখন আর আপনার ভাবনার কিছু নেই। আপনি নির্ভয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

কীর্তি তবু জিজ্ঞেস করলে—ফুটো-টুটো নেই তো?

বিনোদ দাস যেন আকাশ থেকে পড়লো। বললে—ফুটো? ফুটো হাঁড়ি বিনোদ দাস বেচবে? বিনোদ দাস যদি ফুটো হাঁড়ি বেচতো তাহলে এ্যাদ্দিনে এই দোকান সোনা দিয়ে মুড়ে ফেলতে পারতো। আপনার ভাগ্যি ভালো যে আপনি আজে-বাজে দোকানে যান্‌নি। একেবারে সোজা বিনোদ দাসের দোকানে এসে গেছেন।

কীর্তি সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলে—কত দাম হাঁড়িটার?

বিনোদ দাস হাঁড়িটার গলায় দড়ি দিয়ে বাঁধতে বাঁধতে বললে—বিনোদ দাসকে দর জিজ্ঞেস করে লজ্জা দেবেন না। আমি আপনার গলা কাটবো না, ন্যায্য দর নিই বলেই বিনোদ দাসের বাজারে এত নাম-ডাক। আর, আর একটা কথা তাহলে বলি আপনাকে। কাউকে বলবেন না যেন। ভাগ্যিস আজকে আপনি আমার দোকানে এলেন তাই, নইলে পরশুদিন এলে আমাকে আর পেতেন না—

কীর্তি জিজ্ঞেস করলে—কেন?

বিনোদ দাস বললে—আরে, আপনি বোম্বাগড়ের নাম শুনেছেন?

কীর্তি বললে—হ্যাঁ—খুব শুনেছি—

বিনোদ দাস বললে—বিরাট দেশ মশাই, বিরাট দেশ, নাম তো শুনবেনই। সেই দেশের বড়-রাজকুমার এই জম্বুদ্বীপে এসেছেন, তা জানেন?

—কী জন্যে এসেছেন?

—কেন আবার? এই বিনোদ দাসের জন্যে! সেই রাজবাড়িতে ভাত রান্নার জন্যে হাঁড়ির দরকার। সেখানে যে-সব কুমোর আছে তাদের হাঁড়িতে ভাত চড়ালেই কাঠের আঁচে হাঁড়িগুলো ফেটে যায়। তাই আমাকে নিয়ে যেতে তিনি নিজে এসেছেন, আমাকে সেখানে গিয়ে মাটির হাঁড়ি তৈরি করিয়ে দিতে হবে, যত টাকা লাগে তা মহারাজা দেবেন। একটা হাঁড়ি অন্তত এক বছর চলা চাই, এই তাঁর শর্ত—এই তাঁর কড়ার—

কথা শেষ হবার আগেই আর একজন খদ্দের এল।

বিনোদ দাস জিজ্ঞেস করলে—কী চাই?

লোকটা বললে—একটু ভালো দেখে হাঁড়ি আছে?

বিনোদ দাস রেগে গেল। বললে—হাঁড়ির দোকানে হাঁড়ি থাকবে না তো কি মাছ-মাংস থাকবে?

লোকটা বললে—না না তা বলছি না, বলছি যে হাঁড়ি তো আপনার দোকানে সাজানো রয়েছে দেখতেই পাচ্ছি, কিন্তু বেশ ভালো মজবুত হাঁড়ি আছে কিনা তাই জিজ্ঞেস করছি—

বিনোদ দাস বললে—আরে মশাই আপনি জানেন না এটা কার দোকান? বিনোদ দাসের দোকান। নাম শুনেছেন? বিনোদ দাস কখনও বাজে হাঁড়ি বেচে না। এই তো এই ভদ্দরলোক হাঁড়ি কিনছেন, একটু দর-দস্তুর পর্যন্ত করেন নি, আমি যে-দাম চেয়েছি সেই দামই দিয়েছেন, ফুটো আছে কিনা তাও জিজ্ঞেস করেন নি। আমি যে-দাম বলেছি তাই-ই দিয়ে দিয়েছেন, একেই জিজ্ঞেস করুন না আপনি—ইনি বিনোদ দাসের নাম শুনেই হাঁড়ি কিনতে এসেছেন—।

লোকটা কীর্তির দিকে চাইলে। জিজ্ঞেস করলে—হ্যাঁ মশাই, এ খুব মজবুত হাঁড়ি?

কীর্তি আর কী বলবে! বললে—হ্যাঁ, আমি তো হাঁড়ি চিনি না। বিনোদ দাসের হাঁড়ির নাম-ডাক আছে তাই নির্ভয়ে কিনছি—

বিনোদ দাস বললে—আপনার যদি অত সন্দেহ হয় তো আপনাকে আমার দোকান থেকে হাঁড়ি কিনতে হবে না। আমি আপনাকে হাঁড়ি বেচবো না। বোম্বাগড় থেকে আমাকে সাধাসাধি করছে সেখানে গিয়ে রাজবাড়ির ভাত রান্নার হাঁড়ি তৈরি করে দেবার জন্যে, আর আপনি আবার সন্দেহ করছেন? আপনি অন্য দোকানে যান, আমি আপনাকে হাঁড়ি বেচবো না মশাই—যান—

লোকটা আর দাঁড়ালো না, চলে গেল।

কীর্তি জিজ্ঞেস করলে—আপনি দোকানী হয়ে ওকে হাঁড়ি বেচলেন না কেন?

বিনোদ দাস বললে—ও যে জম্বুদ্বীপের লোক। জম্বুদ্বীপের লোক মাত্রই ছ্যাঁচড়া।

কীর্তি জিজ্ঞেস করলে—তাহলে আমাকে বেচলেন কেন?

বিনোদ দাস বললে—আপনি যে বিদেশী লোক। আমি দেখেই চিনতে পেরেছি আপনি বিদেশী, তাই বেচলুম! জম্বুদ্বীপের লোকরা যেমন ছ্যাঁচড়া, তাদের সঙ্গে তেমনি ছ্যাঁচড়া ব্যবহারই করতে হয়!

বলে বিনোদ দাস হাঁড়িটা এগিয়ে দিলে কীর্তির দিকে। বললে—এই নিন্—

দাশরথি অনকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছিল তার সেই জায়গাটায়। বড়-রাজকুমার আর আসে না, আসে না। কী হলো বড়-দাদাবাবুর? এত দেরি হচ্ছে কেন?

আর খানিক পরেই দেখলে বড়-দাদাবাবু একটা মস্ত মাটির হাঁড়ি হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে আসছে।

কাছে আসতেই দাশরথি হাঁড়িটা নিজের হাতে নিয়ে নিলে। জিজ্ঞেস করলে—এ হাঁড়িটা আবার কিনলেন কেন? হাঁড়ি কী হবে?

কীর্তি বললে—হাঁড়ি না কিনলে লোকটাকে পরখ করবো কী করে?

—তা, কেমন দেখলেন বিনোদ দাসকে? বোকা, না চালাক?

কীর্তি বললে—লোকটা বোকাও নয় আবার চালাকও নয়। কারবারী। কারবার করবার কায়দা জানে। তবে কথা বেশি বলে। কথা বেশি বলা বোকার লক্ষণ!

দাশরথি বললে—তাহলে কি বিনোদ দাসকেই পছন্দ করলেন?

কীর্তি বললে—এখনও ভাবছি—

দু'জনে রাস্তা দিয়ে বাড়ির দিকেই যাচ্ছিল। কীর্তিনারায়ণ সত্যিই ভাবছিল খুব। যে-লোকটা অত কথা বলে সে তো বোকা ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু ডাহা মিথ্যে কথাগুলো কেমন গড়-গড় করে বলে গেল। বোম্বাগড়ের মহারাজা নাকি বিনোদ দাসকে ডেকে পাঠিয়েছে তাকে দিয়ে ভাত রান্নার হাঁড়ি তৈরি করিয়ে নেবার জন্যে! এ-কথাগুলো, এই ডাহা মিথ্যে কথাগুলো কেন শোনালো! এ তো কারবারী লোকের লক্ষণ!

দাশরথিও সব শুনে বললে—মিথ্যেবাদীরা কি বোকা হয় বড়-দাদাবাবু?

কীর্তি বললে—তা হয়। মিথ্যে কথা-সত্যি কথার সঙ্গে চালাক-বোকা লোকের কোনও সম্পর্ক নেই—। অনেক সময় বোকা-লোক চালাক-লোক দু'রকম লোকেই

মিথ্যে কথা বলে। আবার চালাক লোকও সত্যি কথা বলতে পারে। আমি ভেবে দেখি বিনোদ দাস ঠিক খাঁটি বোকা কিনা—

হঠাৎ একটা কাণ্ড হলো।

দাশরথি কীর্তিনারায়ণের পাশে পাশে চলছিল। দাশরথির হাতে দড়িতে বাঁধা হাঁড়িটা ছিল। কে যেন সেই হাঁড়িটাতে হঠাৎ একটা ঘা দিলে আর সঙ্গে সঙ্গে সেটা ভেঙে একেবারে চুরমার হয়ে গেল। চুরমার হয়ে গিয়ে টুকরো টুকরো হয়ে রাস্তার ওপর পড়ে গেল।

দুজনেই পেছন ফিরে দেখলে একটা গরুর গাড়ি ভর্তি লম্বা লম্বা বাঁশ আসছিল, সেই বাঁশের ডগা এসে হাঁড়িতে ধাক্কা লাগিয়েছে।

দাশরথি রেগে গেল। গরুর গাড়িতে একজন গাড়োয়ান বসে গাড়ি চালাচ্ছিল, দাশরথি তার দিকে চেয়ে বলে উঠলো—তুমি কী রকম লোক হে? এমন করে গাড়ি চালাচ্ছো যে আমার হাঁড়িটায় ধাক্কা দিয়ে ভেঙে দিলে? এখন কী হবে? আমাদের এ হাঁড়ির দাম দিতে হবে তোমাকে—

গাড়োয়ানটা বললে—বারে, দোষ করলে তুমি আর যত তম্বি আমার ওপর?

দাশরথি বললে—আমি দোষ করেছি না তুমি দোষ করেছ? আমি তো রাস্তার এক কিনারা দিয়ে যাচ্ছি, গাড়িটা মাঝ-রাস্তা ছেড়ে আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চালাতে গেলে কেন?

খুব বচসা বেধে গেল দুজনে। দাশরথি যত চেঁচায়, গাড়োয়ানটাও চ্যাঁচায় তত। রাস্তার মধ্যে লোক জমে গেল অনেক। সবাই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিড় করে মজা দেখতে লাগলো।

তার মধ্যে থেকে একজন লোক কাছে এসে বললে—তোমরা কোত্থেকে এই হাঁড়ি কিনেছিলে বলো তো?

কীর্তিনারায়ণ বললে—বিনোদ দাসের দোকান থেকে।

লোকটা বললে—বিনোদ দাসের দোকান থেকে হাঁড়ি কিনেছ? তাহলে তো ভাঙবেই! ওই গাড়োয়ানটাও বিনোদ দাসের লোক।

দাশরথি অবাক।

বললে—তাহলে কি বিনোদ দাস মশাই মাটির হাঁড়ির ব্যবসাও করে আবার বাঁশের ব্যবসাও করে?

লোকটা বললে—আরে হ্যাঁ মশাই। ওই মাটির হাঁড়ি যাতে বেশি ভাঙে সেই জন্যেই তো সঙ্গে সঙ্গে বাঁশের ব্যবসাও ধরেছে। মাটির হাঁড়ি আর রোজ-রোজ কার ভাঙে বলো!

দাশরথি বললে—ওরে, পেটে পেটে এত বুদ্ধি?

লোকটার কথায় আরো কয়েকজন সায় দিলে। তারাও বললে—সেই জন্যেই তো বিনোদ দাসের দোকান থেকে আমরা কেউ হাঁড়ি কিনি না। তোমরা কেন হাঁড়ি কিনতে গেলে ওই দোকানে?

দাশরথি জিজ্ঞেস করলে—তা জম্বুদ্বীপে কোটাল-মন্ত্রী-রাজা কেউ নেই? এর বিচার হয় না, এর সাজা হয় না এদেশে?

আর একজন কাছে এসে বললে—তোমরা মিছি মিছি বাজে কথা বলে সময় নষ্ট করছো কেন? হাত থাকতে মুখ চালাচ্ছ কেন? দাও না গাড়োয়ানটাকে দু'ঘা বসিয়ে। ব্যাটা বুঝুক মজাটা।

আর একজন এসে উপদেশ দিতে লাগলো—অত কথায় কাজ কী তোমাদের? সোজা কোতোয়ালের কাছে চলে যাও, সেখানে গিয়ে সব বলো গে। আমরাও সঙ্গে যাচ্ছি, চলো—

দাশরথি বললে—আপনারাও সাক্ষী হবেন? আপনারা যা দেখেছেন যা শুনেছেন সব কোতোয়ালকে বলবেন?

লোকটা বললে—নিশ্চয় বলবো, আমরা যা দেখেছি, যা শুনেছি, সব বলবো. তোমাদের কোনও ভয় নেই. চলো চলো কোতোয়ালের কাছে—

দাশরথি বড়-রাজকুমারের দিকে চাইলে। কীর্তি-নারায়ণ তখন বেশ মজা পাচ্ছিল। এ তো বড় বিচিত্র দেশ। এরা হাঁড়ি বিক্রি করে আবার সেই হাঁড়ি যাতে আরো বেশি বিক্রি হয় তাই তা ভাঙবার ব্যবস্থাও রেখেছে!

কীর্তিনারায়ণ লোকটাকে বললে—আচ্ছা, আপনারা যে বলছেন বিনোদ দাস হাঁড়ি ভাঙবার জন্যে বাঁশের ব্যবস্থা করেছে, তা বাড়িতে যারা হাঁড়ি ব্যবহার করছে সে-হাঁড়িগুলো কী করে সে ভাঙবে? সে-হাঁড়িগুলো তো আর রান্না-ঘরে ঢুকে বাঁশ দিয়ে ভাঙতে পারবে না। তার বেলায় কী হবে?

—তার বেলায় অন্য ব্যবস্থা আছে!

কীর্তিনারায়ণ বললে—কী ব্যবস্থা?

লোকটা বললে—যখন মেয়েরা হাঁড়ি নিয়ে পুকুরে ধুতে যায় তখন দূর থেকে ঢিল মারবার জন্যে ছেলেদের রেখেছে। তাদের পয়সা দেয় বিনোদ দাস। বলে দেয়—হাঁড়ি দেখলেই তোরা ঢিল মারবি।

দাশরথি বললে—তাহলে তো মশাই আপনারা বড় কষ্টে আছেন। আপনাদের দেশে তো কোনও আইন-কানুন নেই! আপনারা এ-দেশে বাস করছেন কী করে? এত অত্যাচার সহ্য করছেন কেমন করে, দেশ ছেড়ে অন্য দেশে চলে যান—

লোকটা বললে—এ-দেশে থাকবো না তো যাবো কোথায়? চলুন, আজকে আমরা কোতোয়ালের কাছে গিয়ে এর একটা হেস্ত-নেস্ত করবোই, চলুন, চলুন, সবাই চলুন—

দাশরথি বললে—তাই চলুন, আপনারা কোতোয়ালকে সব বলবেন তো? যা দেখেছেন যা শুনেছেন সব বলবেন তো?

সবাই বললে—নিশ্চয় বলবো, আমরা তো সাক্ষী হবো. আমরা সবাই এর বিহিত চাইবো—

—তাহলে চলুন, কোতোয়ালের কাছে চলুন—

বলে সবাই কোতোয়ালির দিকে চলতে লাগলো। বিনোদ দাসের সাজা হলে সবাই খুশী হবে। সবাই কীর্তিনারায়ণ আর দাশরথিকে সঙ্গে নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলো।

(ক্রমশ)

ছবি এঁকেছেন ॥ সুধীর মৈত্র

অঙ্কের মজা, মজার অঙ্ক/শুভঙ্কর

এক টুকরো কাগজে বেশ বড়ো বড়ো করে লেখ, "উত্তর হবে পাঁচ"। লিখে কাগজটা চার ভাঁজ করে বন্ধুর পকেটে গুঁজে দাও। বন্ধুকে কিন্তু আগে-ভাগে দেখাবে না, কী লিখেছ কাগজটায়।

এবার তোমার বন্ধুকে বলো, কাগজ-পেনসিল নিয়ে বসতে। তুমি তাকে পর-পর এই কটি জিনিস করে যেতে বলো: (ক) যেমন-খুশী একটি সংখ্যা কাগজে লেখ। (খ) লিখেছ? যে-সংখ্যাটি লিখেছ তার পরবর্তী সংখ্যাটিও এর তলায় লেখ। (গ) সংখ্যা দুটো যোগ করে ফেল। (ঘ) যোগ হয়েছে? এবার এই যোগফলের সঙ্গে ৯ যোগ দাও। (ঙ) যোগফলকে ২ দিয়ে ভাগ করো। (চ) কোনো ভাগশেষ নেই তো? নেই? বেশ। এবার ভাগফল থেকে তোমার সর্বপ্রথম-লেখা সংখ্যাটি বিয়োগ দাও।'

বন্ধুকে তুমি পর-পর যেমন বলেছ, সে তেমনই করে চলেছে। তার লেখার দিকে তুমি একবারও তাকাওনি। সুতরাং শেষ পর্যন্ত অঙ্কটার কী উত্তর হবে তোমার জানার কথা নয়। তবু বন্ধুর উত্তরটি যে তুমি আগেই লিখে রেখেছো—এ-কথা বলে তার পকেটে-রাখা কাগজটি খুলে এখন মেলাতে বলো। সে অবাক হয়ে দেখবে, কী আশ্চর্য ব্যাপার। উত্তর সত্যিই পাঁচ হয়েছে। সব সময়ই এই উত্তর হবে। দেখবে?

বেশ তো একটা উদাহরণ নাও। ধরো, তোমার বন্ধু লিখল: ৫৭। এর তলায় সে লিখল পরবর্তী সংখ্যা ৫৮। যোগ করে হল ১১৫। এই যোগফলের সঙ্গে ৯ যোগ হবে। সংখ্যাটি হল ১২৪। ১২৪কে ২ দিয়ে ভাগ করলে ৬২ হচ্ছে। ৬২ থেকে এখন প্রথম-লেখা সংখ্যা অর্থাৎ ৫৭ বিয়োগ দিতে হবে। বিয়োগফল ৫। তুমি তো আগে-ভাগে পাঁচই লিখে রেখেছো। কী মজার ব্যাপার। তাই না?

টুপির কারচুপি

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

নীলাদ্রি সরকারের ফ্ল্যাটে আড্ডা দিতে গেলুম। কর্নেল ষাট-বাষট্টি বছরের বুড়ো। মাথায় টাক ও মুখে দাড়ি আছে। একেবারে সায়েবদের মতো চেহারা। খিস্টান। ভারি অমায়িক আর হাসিখুশি মানুষ। একা থাকেন।

কিন্তু বুড়ো হলে কি হবে! এখনও ও'র গায়ে পালোয়ানের মতো জোর আছে। দৌড়ে পাহাড়ে চড়তে পারেন। বাঁ হাতে রাইফেল ছুড়ে বাঘ মারতে পারেন। পারেন না কি, তাই-ই বলা কঠিন। সারাজীবন নানা দেশে বিদঘুটে এ্যাডভেঞ্চারে গেছেন—জঙ্গলে, সমুদ্রে, দ্বীপে, বরফের দেশে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে আফ্রিকা আর বর্মা ফ্রন্টে যুদ্ধ করেছেন। অবসর নেবার পর ও'র হবি হচ্ছে দুর্লভ জাতের পাখি, পোকামাকড় ও প্রজাপতি খুঁজে বেড়ানো। এজন্যে প্রায়ই উনি পাহাড়ে জঙ্গলে বেরিয়ে পড়েন। সঙ্গী বলতে আমি—এই জয়ন্ত চৌধুরী। আমার মতো একজন যুবকের সঙ্গে ওই বুড়োর গলাগলি ভাব যে কতটা, না দেখলে বিশ্বাস হবে না কারও।

এই কর্নেলবুড়োর আরেক বাতিক গোয়েন্দাগিরি। অনেক বড় বড় ডাকাতি আর খুনের হিল্লে করে খ্যাতি কুড়িয়েছেন। শুধু পুলিশ মহলের নয়, সবখানেই ও'র নামটা বিলক্ষণ চেনা। কেউ যদি বলে 'বুড়ো ঘুঘু', তাহলে বুঝতে হবে সে নির্ঘাৎ কর্নেলের কথাই বলছে।

সেই রোববারের সকালে ও'র বাসায় গেলুম, তার পিছনে একটা উদ্দেশ্যও ছিল। আমি দৈনিক সত্যসেবক পত্রিকার এক রিপোর্টার। আমাদের কাগজেই একটা অদ্ভুত খবর বেরিয়েছিল। জানতুম, অদ্ভুত যা কিছু—তাতেই কর্নেলের কৌতূহল। উনি নাক না গলিয়ে থাকতে পারবেন না। আর এই খবরটা শুধু অদ্ভুত নয়, রীতিমতো অবিশ্বাস্য!

তো, আমাকে দেখেই বুড়ো হাসতে হাসতে বললেন—এস জয়ন্ত! এক্ষুনি তোমার কথা ভাবছিলুম। নিশ্চয় তুমি সেই ভুতুড়ে টুপির ব্যাপারে খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েছ!

বললুম—ভুতুরে টুপি, না জ্যান্ত টুপি?

—একই কথা। বলে কর্নেল খবরের কাগজ খুলে একবার চোখ বুলিয়ে নিলেন। তারপর বললেন—ব্যাপারটা বেশ মজার, তাই না জয়ন্ত? চোঙার মতো সুচলো ডগাওয়ালা এই ধরনের টুপি খ্রিস্টমাসের পরবে পরা হয়। আবার সার্কাসের ক্লাউনরাও এমন টুপি পরে ভাঁড়ামি করে। সেই টুপি কি না ইচ্ছেমতো চলে বেড়ায়। লাফায়। নাচে। বিছানায় ঘুমোয়। খাবার টেবিলে গিয়ে খেতে বসে। ইজিচেয়ারে আরামে গড়ায়। খাসা! ভাবা যায় না! টুপির মালিক যে ঘাবড়ে যাবেন, তাতে সন্দেহ কি!

বললুম—শুদ্ধ তাই নয় কর্নেল। বাগানে গিয়ে গোলাপ গাছে চড়ে চমৎকার দোল খায় ব্যাটা।

কর্নেল খুব হাসলেন। তারপর বললেন—বসো। এক্ষুনি টুপির মালিক মিঃ গজেন্দ্রকিশোর সিংহরায় এসে পড়বেন। একটু আগে আমায় ফোন করছিলেন।

কর্নেলের পরিচারিকা মিস এ্যারাথুন একটা ট্রেতে কফি রেখে গেল। কফির পেয়ালায় সবে মুখ দিয়েছি, দরজায় ঘন্টা বাজল। তারপর এক প্রকান্ড দশাসই চেহারার স্যুট-পরা ভদ্রলোক ঢুকলেন। ও'র হাতে একটা কিটব্যাগ। আমাকে নমস্কার করলেন, আর কর্নেলের সঙ্গে করলেন হ্যান্ডশেক। আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন কর্নেল। সোফায় গম্ভীর মুখে উনি বসলে কর্নেল বললেন—মিঃ সিংহরায়, বলুন কি করতে পারি আপনার জন্যে?

সিংহরায় বললেন—আপনাকে ফোনে তো সবই বলেছি, কর্নেল। নতুন করে কিছু বলার নেই। ব্যাপারটা আজ তিনদিন ধরে সত্যিসত্যি ঘটছে। খবরের কাগজে তো দূরের কথা, বাড়ির কাকেও আমি বলিনি। অথচ কিভাবে ফাঁস হয়ে গেল, কে জানে! খবরের কাগজেই বা কে খবরটা দিল—কিছু বুঝতে পারছিনে! সেজন্যেই তো আপনার সাহায্য চাইছি।

কর্নেল মুখ খোলার আগে আমি অবাক হয়ে বললুম—খবরটা নিশ্চয় কোন রিপোর্টারকে কেউ দিয়েছে! না দিলে কাগজে বেরোতেই পারে না।

সিংহরায় উদ্বিগ্নমুখে বললেন—সেটাই তো আশ্চর্য লাগছে।

কর্নেল ভুরু কুঁচকে কি ভাবছিলেন। বললেন—হুম! কিন্তু টুপিটা

যে ওইসব অদ্ভুত কান্ড করছে, তা তো সত্যি?

সিংহরায় জবাব দিলেন—একেবারে হুবহু সত্যি। টুপিটা কিনেছি গত বিষ্যুৎবার চৌরঙ্গীর একটা নীলামের দোকানে। অদ্ভুত-অদ্ভুত জিনিস কিনে ঘরে সাজিয়ে রাখা আমার বাতিক। টুপিটা দেখতে অদ্ভুত লাগল। পাঁচিশটাকা থেকে দর হাঁকাহাঁকি শুরু হল। তিরিশে উঠেই অন্যরা ছেড়ে দিল। শুধু একজন...

—হুম! বলুন।

—একজন অবাঙালী ভদ্রলোক ছাড়ল না। দর চড়াতে থাকল। তাই আমারও জেদ চড়ে গেল। শেষঅব্দি রোখের মাথায় তেরো হাজার টাকা হাঁকলুম। তখন লোকটা সরে গেল। টুপি নিয়ে বিজয়গর্বে বাড়ি ফিরলুম। এবং তারপর সন্ধ্যাবেলা থেকেই টুপি খেল দেখানো শুরু করল। ড্রয়িংরুমের কোনায় একটা ছোট্ট টেবিলে ওটা রেখেছিলুম। বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছি, হঠাৎ দেখি টুপিটা টেবিলের ওপর চলতে চলতে নিচে পড়ে গেল। তখনও সন্দেহ হয়নি। ওটা সেখানেই তুলে রেখে ওপরের ঘরে গেছি। খাওয়াদাওয়া করেছি। শুতে গিয়ে দেখি, আশ্চর্য! টুপিটা বিছানায় শুয়ে আছে। বাড়ির সব্বাইকে জিগ্যেস করলুম—কেউ কিছু জানে না। সবচেয়ে আশ্চর্য কান্ড ঘটল শুক্রবার রাতে। টুপিটা শোবার ঘরেই রেখেছিলুম। রাত দুটোয় হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। ঘরে খসখস শব্দ শুনে সুইচ টিপে টেবিলল্যাম্প জ্বাললুম। দেখি—টুপিটা মেঝেতে দিব্যি হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে জানলার দিকে যাচ্ছে। তারপর চোখের সামনে সেটা জানলা গলিয়ে লাফ দিল। বিশ্বাস করুন কর্নেল, যা বলছি—এর মধ্যে এতটুকু মিথ্যে নেই।

—হুম! বলুন, বলুন!

মিঃ সিংহরায়ের মুখে ভয়ের ছাপ ফুটে উঠল। দম নিয়ে বললেন—তক্ষুনি টর্চ আর পিস্তল নিয়ে নিচে গেলুম। দেখলুম, টুপিটা বুগেন-ভিলিয়ার গাছে কাত হয়ে যেন ঘুমোচ্ছে। সবচেয়ে অবাক কান্ড হল গত রাতে। টুপিটা কখন ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে। একটা গোলাপগাছে চড়ে বসেছে। আজ ভোরবেলা মালী দেখতে পেয়ে...

কর্নেল বাধা দিয়ে বললেন—হুম, বুঝেছি। টুপিটা কি এনেছেন?

—এনেছি। এই বিদঘুটে জিনিস আর কাছে রাখতে একটুও ইচ্ছে নেই কর্নেল।...বলে সিংহরায় কিটব্যাগ খুলে একটা চোঙার মতো টুপি বের করলেন। প্রকান্ড টুপি। কালোরঙ। সুচলো ডগায় একটা রেশমি টুপি আছে। দুপাশে দুটো দুষ্টুহাসিভরা মুখ—একদিকেরটা ছেলের, অন্য দিকেরটা মেয়ের। আমার নাকে কড়া গন্ধ লাগল। নিশ্চয় টুপির গন্ধ।

কর্নেল টুপিটা নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে বললেন—হুম, বেশ ওজন আছে দেখছি। শক্ত সমর্থ মাথা না হলে ঘাড় ব্যথা করবে। কিন্তু এ টুপি তো প্রশান্ত মহাসাগরের মাকাসিকো দ্বীপপুঞ্জের বাসিন্দারা পরে। বুনো বেড়ালজাতীয় জন্তুর চামড়ায় তৈরি।

আমি ব্যস্ত হয়ে বললুম—কর্নেল, কর্নেল! গতবছর মাকাসিকোতে রাজাকে হটিয়ে এক সেনাপতি সিংহাসন দখল করেছিল না? রাজা অনুহিটিকি পালিয়ে গিয়ে আমেরিকায় আশ্রয় নিয়েছিলেন! খুব খুনোখুনি আর লুঠপাট হয়েছিল রাজপ্রাসাদে।

কর্নেল আমার দিকে তাকিয়ে বললেন—অপূর্ব জয়ন্ত, অপূর্ব! তাই-ই তো বটে। হাজার হলেও তুমি খবরের কাগজের লোক! ইয়ে মিঃ সিংহরায়, তাহলে টুপিটা আমার কাছে আপাতত থাক। আপত্তি আছে?

সিংহরায় যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।—মোটেও না! বরং বেঁচে গেলুম, কর্নেল। বাপস এখনও আমার বুক ঢিপঢিপ করছে! ওই ভুতুড়ে টুপি এবার হয়তো গলা টিপে মেরেই ফেলবে মশাই!

কর্নেল বললেন—ঠিক আছে। আমি সন্ধ্যার দিকে আপনার বাড়িতে যাচ্ছি। জয়ন্তও যাবে আমার সঙ্গে। কেমন!

সিংহরায় মাথা দুলিয়ে সায় দিলেন।

কথামতো সাড়ে পাঁচটায় আবার কর্নেলের ফ্ল্যাটে গেলুম। দেখি, আমারই অপেক্ষা করছেন উনি। একটু হেসে বললুম—টুপিটা নিশ্চয় আপনাকে খুব জ্বালিয়েছে কর্নেল?

কর্নেল গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বললেন—না জয়ন্ত। এবং সেটাই আশ্চর্য!

—কেন, কেন?

—টুপিটা যদি সত্যি ভুতুড়ে হবে, তাহলে সবখানেই ভুতুড়ে কান্ড করবে। অথচ আমার ঘরে এসে একেবারে শান্ত খোকাবাবুটি বনে গেল! কোন মানে হয় না জয়ন্ত!

—তাহলে কি সিংহরায় মিথ্যে বলছেন? খবরের কাগজেও কি উনি নিজেই খবরটা দিয়েছেন? কিন্তু এসবের উদ্দেশ্য কি কর্নেল? সিংহরায় কেন এমন আজগুবি ঘটনা রটাচ্ছেন?

—সব কিছু জানতেই ওঁর বাড়ি যাচ্ছি আমরা। চলো, বেরিয়ে পড়া যাক্।......

নিউ আলিপুরে সিংহরায়ের ইভনিং লজে যখন আমরা পৌঁছলুম, তখন সন্ধ্যা ছটা। বিশাল বাড়ি। চওড়া লন, ফুলবাগিচা, টেনিস কোর্ট আছে। আমাদের অভ্যর্থনা করে প্রকান্ড ড্রয়িংরুমে নিয়ে গিয়ে বসালেন। টুপিটা কর্নেলের হাতে ছিল। সোফার এককোণে রেখে পাশেই বসলেন। তারপর কথাবার্তা শুরু হল। দেখলুম, কর্নেল টুপির কথা মোটেও তুললেন না। ঘরের নানান শিল্পসামগ্রী নিয়ে পুরাতত্ত্বে চলে গেলেন। ওসব পন্ডিতি ব্যাপার আমি বুঝিনে। চুপচাপ বসে রইলুম।

হঠাৎ আমার চোখে পড়ল টুপিটা নড়ছে। নড়তে নড়তে সোফার পিছনে চলে যাচ্ছে। ঘরে আলো খুব উজ্জ্বল নয়। হাল্কা ধুসর আলো জ্বলছে। আমি নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলুম না। এত অবাক, আর ভয়ে কাঠ হয়ে গেছি যে মুখ দিয়ে কথা বেরুচ্ছে না। টুপিটা সোফার পিছন দিয়ে মাতালের মতো টলতে টলতে এগোচ্ছে। ডগার থুপিটা ঝাঁকুনি খাচ্ছে। দেখতে দেখতে ওটার গতি বাড়ল। দরজার কাছে যেতেই আমি এতক্ষণে চেঁচিয়ে উঠলুম—কর্নেল! কর্নেল! টুপি! টুপিটা পালাচ্ছে!

সিংহরায় হাঁ করে তাকিয়ে আছেন। কর্নেলকে দেখলুম, মিটিমিটি হেসে এবার উঠে দাঁড়ালেন। তারপর দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। তখন টুপিটা দরজার বাইরে অদৃশ্য হয়েছে!

কর্নেল দেখলুম দরজার কাছে গিয়েই আচমকা লাফ দিলেন। তারপর উনিও অদৃশ্য। এতক্ষণে আমার হুঁস এল যেন। দৌড়ে বেরিয়ে ডাকলুম—কর্নেল! কর্নেল!

অমনি লনের ওদিকে গেটের কাছে দুড়ুম দুড়ুম আওয়াজ হল। নিশ্চয় কেউ গুলি ছুঁড়ল। দারোয়ান চাকরবাকর চেঁচিয়ে উঠল। দৌড়োদৌড়ি শুরু হল! গেটে গিয়ে দেখি, কর্নেল একহাতে টুপি অন্য হাতে পিস্তল নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে সেই মিটিমিটি হাসি। রুদ্ধশ্বাসে বললুম—কি ব্যাপার কর্নেল?

কর্নেল বললেন—আমার কাছে নয়, ওখানে সব রহস্য পড়ে আছে, জয়ন্ত। ওই দেখ, দেখতে পাচ্ছ?

কর্নেলের সামনে নুড়িবিছানো রাস্তায় একটা ছোট্ট বিলিতি কুকুর মরে পড়ে আছে। বুকের কাছে রক্তের ছোপ। সিংহরায় এসে ঝাঁপিয়ে পড়ে আর্তনাদ করে উঠলেন—জিমি! জিমি! কে তোকে খুন করল?

কর্নেল ওঁর কাঁধে হাত দিয়ে ডাকলেন—মিঃ সিংহরায়, জিমিকে ওর আসল মালিকরা এইমাত্র গুলি করে মেরে গেল। জিমিকে আপনি নিশ্চয় সদ্য কিনেছিলেন! তাই না?

সিংহরায় উঠে দাঁড়ালেন। —হ্যাঁ। যেদিন টুপিটা কিনি, সেদিনই বিকেলে একটা লোক বেচতে এনেছিল। কিন্তু আমি তো এসব কিছু বুঝতে পারছি না!

—দেখুন, এই টুপির মধ্যে নিশ্চয় কিছু দামী মণিমুক্তো লুকনো আছে। টুপিটা হাতাবার জন্যেই জিমিকে ওরা আপনার কাছে বেচেছিল। টুপিতে একরকম গন্ধ মাখানো আছে। মাকাসিকো দ্বীপের একজাতের ফুলের গন্ধ। বহুকাল টি'কে থাকে এই গন্ধ। ওরা এই গন্ধ যোগাড় করে জিমিকে শুঁকিয়ে খুব ট্রেনিং দিয়েছিল বোঝা যাচ্ছে। তবে ট্রেনিং জিমির তেমন রপ্ত হয়নি। সময় যথেষ্ট পায়নি। তাই টুপিটা ওদের কাছে পোঁছে দেবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। ওরা এইক'দিন রাস্তায় ওঁত পেতে অপেক্ষা করেছে বেচারা জিমির!

সিংহরায় হতভম্ব হয়ে বললেন—তাহলে টুপির তলায় জিমিটাই ঘুরে বেড়াত?

—অবশ্যই। ভুতুড়ে টুপির রহস্য হচ্ছে এই। আর খবরের কাগজে খবর দিয়েছিল ওরাই—যাতে টুপিটা হারালে ভূতের ঘাড়েই দোষটা চাপানো যায়। বুঝলেন তো? অটুকুন কুকুর—খাড়াই মোটে ছ'ইঞ্চি। টুপির তলায় ঢুকলে তো ওকে দেখা যাবে না।

এরপর আমরা ড্রইংরুমে ফিরে গেলুম। ছুরি দিয়ে টুপির ভেতরটা চিরে দিতেই গুচ্ছের রঙীন পাথর ঠিকরে পড়ল। চোখধাঁধানো রঙ সব। আমি লাফিয়ে উঠলুম—কর্নেল! রাজা আনুহিটাকি পালাবার সময় অনেক ধনরত্ন নিয়ে যান। পথে অনেক খোওয়া গিয়েছিল নাকি। এই টুপিটার মধ্যেও কিছু ছিল দেখা যাচ্ছে।

কর্নেল চুরুট জেবলে শুধু বললেন—হুম!

মনে মনে বললুম—ওহে বুড়ো-ঘুঘু! সত্যি, তোমার তুলনা নেই।......

ছবি এঁকেছেন ॥ সুবোধ দাশগুপ্ত

বানরেরা মানুষ হচ্ছে

মিনতি রায়

বানরেরা মানুষের খুবই কাছের জীব, প্রায় নিকট আত্মীয় বললেই চলে। আকারে আচরণে তারা যেমন মানুষের কাছাকাছি, তেমনি বুদ্ধির ব্যাপারেও গোটা জীবজগতে মানুষ ছাড়া আর কেউ তাদের পাশে দাঁড়াতে পারে না।

বানরদের সম্পর্কে এসব কথা সকলেরই প্রায় মোটা-মুটি জানা। যে-সব অঞ্চলে বানর বা হনুমান আছে, সেখানকার লোকেরা এদের বুদ্ধি সম্পর্কে যথেষ্টই সচেতন। অবশ্য সচেতন না হয়ে উপায়ও নেই। বানরের আক্রমণে, আর অত্যাচারে গৃহস্থরা অস্থির হয়ে ওঠে, প্রতিদিনই বানরের হাত থেকে ফসল, তরকারি, খাবার ইত্যাদি রক্ষা করায় গৃহস্থকে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হয়। রীতিমত বুদ্ধির ও বদমায়েসির প্রতিযোগিতা চলে দুই পক্ষের মধ্যে।

অনেকে আবার বানর পোষে। বাচ্চা বয়েস থেকে পুষলে বানর চমৎকার পোষ মানে। আমাদের দেশের বাড়িতে একটা পোষা বানর ছিল। তার নাম ছিলো মধু। মধু ছিলো অত্যন্ত গোলমেলে চরিত্রের। কেউ বাজারে গেলেই হলো, মধু তার পিছু-পিছু যাবে, তারপর হৈ-চৈ-হট্টগোল, দোকানদারের চিৎকার, বেগুন বা মুলো নিয়ে মধুর পলায়ন। মধু কিন্তু সব থেকে অসুবিধায় ফেলতো আমার মাকে। যেখান থেকে যা চুরি করে আনতো, সবাই যেমন বাজার করে এনে মাকে দিতো তেমনি মধুও মার কাছে জমা দিতে আসতো। মা হয়তো পাশের বাড়িতে গল্প করছেন, সেখানেই মধু উপস্থিত হয়ে দুটো কলা তুলে দিলো মার কোলে।

এ রকম একক ঘটনার অবশ্য অভাব নেই। আরো বহু নিদর্শন আছে যেখানে যৌথ, সমাজবন্ধ জীব হিসেবে বানরেরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। বছর পনেরো আগে বিহারের এক শহরে স্থানীয় কুকুরদের সঙ্গে বানরদের প্রায় দুই সপ্তাহ ধরে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছিলো। এই খবর সংবাদসংস্থা মারফত দেশে-বিদেশে বহু কাগজে প্রকাশিত হয়েছিলো। একটি বানরের বাচ্চাকে সামনে পেয়ে কয়েকটা কুকুর মেরে ফেলে। তখন বানর-

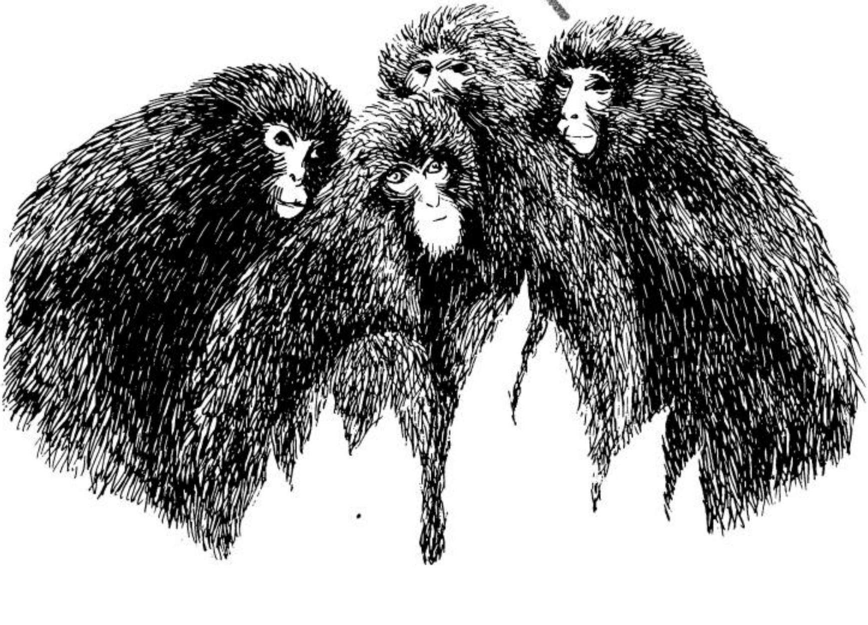

সমাজ খেপে গিয়ে কুকুরদের উপর আক্রমণ শুরু করে. কোথাও কোনো কুকুর একা থাকলেই সঙ্গে সঙ্গে চার-পাঁচটা বানর তাকে তাড়া করতো, কামড়িয়ে-আঁচড়িয়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিতো। মাটির উপরে বানর নামলেই কুকুরেরা আক্রমণ করতো, আর কুকুরদের অসতর্ক অবস্থায় পেলে বানরেরা লাফিয়ে পড়তো। শেষ পর্যন্ত এ-লড়াইয়ে বানরদের জয় হয়, তাদের আক্রমণ-পদ্ধতি, যুদ্ধ-পরিকল্পনা সবই ছিলো উন্নতমানের এবং রাস্তা ও বাজারের কুখ্যাত কুকুরেরা সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে গৃহস্থের সিঁড়ির নীচে, দরজার পিছনে এমনকী এলাকার বাইরে আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়।

বানর অস্ট্রেলিয়ায় নেই, ইউরোপেও বিশেষ নেই। এছাড়া আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়ার যত্রতত্র নানা জাতের, নানা রঙের, নানা চরিত্রের বানর। এর মধ্যে, বিজ্ঞানীদের ধারণা, জাপানের বানরেরা সবচেয়ে বুদ্ধিমান। ধারালো দাঁত, ধূসর রঙের এই জাপানী বানরদের ওজন বিশ কেজি পর্যন্ত হয়। এই বানরেরা গাছে প্রায় থাকে না বললেই চলে, দিনের অধিকাংশ সময় মাটির উপর ঘুরে বেড়ায়, অনায়াসেই তিরিশ গজ পর্যন্ত মানুষের মত দু পায়ে হেঁটে চলে যায়। এবং শুধু তাই নয়, এরা নিজেদের মধ্যে রীতিমত কথাবার্তা বলে, লক্ষ্য করে দেখা গেছে অন্তত চল্লিশটি বিভিন্ন শব্দ উচ্চারণ করে এরা মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে। এই শব্দগুলি শুধু আনন্দ, উত্তেজনা বা ভয় জানাতেই ব্যবহৃত হয় না, খুব বিপদ, আমার রাগ হয়েছে, এই রকম শক্ত কথাও এই বানরেরা নিজেদের মধ্যে ব্যবহার করে।

এই বানরেরা পুরুষানুক্রমে ক্রমাগত উন্নতির দিকে চলেছে। জন্মগতভাবে সমস্ত জীবজন্তুই কিছু বুদ্ধি বাপ-ঠাকুর্দার কাছ থেকে পায়। মানুষ ছাড়া প্রায় সমস্ত জন্তুর এই সহজাত বুদ্ধিটুকুই সম্বল, তারা নিজের থেকে নিজেদের জীবনকালে আর কোন জ্ঞান বা বুদ্ধি নতুন করে কিছু অর্জন করে না, বা করার চেষ্টা করে না। কিন্তু এই জাপানী বানরগুলি আশ্চর্য ব্যতিক্রম। এদের বংশধরেরা জন্মকালে যে বুদ্ধি-বিবেচনা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে, তার সঙ্গে যোগ করে অর্জিত জ্ঞান, এবং পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই বানরদের শতকরা নব্বইভাগ কার্যকলাপ অর্জিত জ্ঞানদ্বারা পরিচালিত হয়।

এই বানরেরা দল বেঁধে বসবাস করে। প্রত্যেক দলে একজন করে দলপতি বা সর্দার। সর্দারের পর কয়েকজন সর্দারের আজ্ঞাবাহী অনুচর এবং তারপর সাধারণ বানরেরা। যখন বানরদল কোথাও বিশ্রাম নেয় তখন দলপতি, অনুচর, মেয়ে বানর ও বাচ্চারা ভিতরে থাকে, বাইরের দিকে তাদের ঘিরে থাকে সাধারণ বানরেরা। নিজেদের মধ্যে কদাচিৎ লড়াই হয়, কিছু গোলমাল হলেই অনুচর বা দলপতির হস্তক্ষেপে তখনই মিটে যায়। দলের নেতৃত্ব নিয়েও লড়াই প্রায় হয় না বললেই চলে। সাধারণত দলপতিরা আকারে-প্রকারে সব অর্থেই প্রধান। তাদের দেখলেই অন্য বানরেরা সমীহ করে; হয়তো চেঁচামেচি করছিলো নিজেদের মধ্যে, কিংবা খাওয়াদাওয়া করছিল, দলপতি সামনে এলেই সব চুপচাপ।

সর্বসম্মতিতে একেকজন দলপতি ক্ষমতায় আসে, এবং প্রায়ই আমৃত্যু সে ক্ষমতায় থাকে। যদি নতুন কোনো বানর ক্ষমতালিপ্সু হয়, সে তার সহগামী এবং অনুচরদের নিয়ে দল থেকে সরে পড়ে অন্যত্র দলপতি হয়। কখনো কখনো এই রকম দুই দলে জীবনমরণ লড়াই হয়। হয়তো এই দল ভেঙে কিছু বানর নতুন দল করলো নতুন সর্দারের অধীনে, তারপর এই প্রতিবেশী দুই দলে বছরের পর বছর লড়াই।

লড়াইয়ের কথা থাক, বানরদের বড় হওয়ার কথা বলি। দুবছর বয়স পর্যন্ত বানর-শিশু মায়ের কোলে আদর-আহ্লাদে বড় হয়। তখনই বানরদের ভাষা, আদব-কায়দা সে আয়ত্ত করে। আট বছর বয়সে সে সাবালক হয়, তার আগে পর্যন্ত ক্ষমতা, বুদ্ধি ও যোগ্যতা অনুসারে সে দলের মধ্যে নিজের স্থান করে নেয়। তিরিশ-চল্লিশ বছর পর্যন্ত তার পরমায়ু। ছেলে-বানরেরা সাধারণত পরিশ্রমী এবং শৃঙ্খলাপরায়ণ হয়। মেয়ে বানরেরা একটু ঝগড়াটে প্রকৃতির আর শিশু বানরেরা ভারী আহ্লাদী। তবে বুদ্ধি পাকবার সঙ্গে সঙ্গে তারা জ্ঞানার্জন শুরু করে। বানরেরা পুরুষানুক্রমে কীভাবে নতুন জ্ঞান অর্জন করছে তার একটা উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। জাপানের এক শ্রেণীর বানর আগে কোনো কিছুই ধুয়ে খেত না। কবেই বা কোন বানরেরা তা খেয়েছে। কিন্তু একবার একটি বানর, একটা মিষ্টি আলুতে ময়লা লেগে ছিলো, সেটা কুড়িয়ে পেয়ে

পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিলো. তারপর থেকে সে যা পেতো সবই ধুয়ে খেতো. এবং ধীরে ধীরে দেখা গেলো, তার সংগী-সাথী এমন কী তার বয়স্কা মা পর্যন্ত সব-কিছুই ধুয়ে খাচ্ছে। এখন সেই দলের সমস্ত বানর সবকিছুই যথাসাধ্য ধুয়ে খায়।

এর চেয়েও ভাল নজির আছে বানরের বুদ্ধি ও অর্জিত জ্ঞানের। চিরদিনই বানরেরা মাটির উপরে চাল-গম কিছু ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকলে আস্তে আস্তে একটা-একটা করে খুঁটে খায়। একদিন একটা বানরের কী বুদ্ধি হলো, এক আঁজলা বালিমেশানো গম নিয়ে নদীর জলে ধুয়ে গমগুলোকে বালি থেকে আলাদা করে খুব পরিতৃপ্তির সংগে খেয়ে ফেললো। এই ঘটনা প্রথম ঘটলো ১৯৫৯ সালে। তারপর ১৯৬২ সালে দেখা গেলো আরো উনিশটি বানর ঐভাবে গম ধুয়ে খাচ্ছে, তারপরে আর পাঁচ বছর পরে প্রায় দলের অর্ধেক বানর এই করতো. এখন প্রায় সবাই তাই করে।

আগে বানরেরা আগুন দেখে ভয় পেতো. তারপর একটা বানর. একবার এক শীতের সন্ধ্যায় কয়েকজন মানুষ আগুন পোহাচ্ছিল. সেখানে কৌতূহলবশে গিয়ে ঠাণ্ডায় আগুনের আরাম কী বুঝতে পারে, তারপর থেকে সে শুধু একাই নয় দলবলসহ নিয়মিত আগুন পোহাতে আসে। মানুষেরা চলে গেলে কিংবা তাদের পাশে বসেই বানরেরা এখন শরীরের তাপ সংগ্রহ করে।

আসলে. যেমন আগুন সম্বন্ধে. তেমনি জল সম্বন্ধে গত বিশ-ত্রিশ বছরে জাপানী বানরদের ভয় একেবারে কেটে গেছে। একবার সমুদ্রের জলে একজন কিছু কড়াইশুঁটি ছুঁড়ে দেয়. কড়াইশুঁটির লোভে কয়েকটা বানর ভয়ে ভয়ে জলে নামে। সেই শুরু হলো, তারপর থেকে দলে দলে বানর গাছ বা মাটির মতই জলের মধ্যে সাবলীল হেঁটে-চলে-সাঁতরিয়ে বেড়াচ্ছে। বানর শিশুরা গরমের দিনে সমুদ্রের জলে সারাক্ষণ লুটোপুটি খাচ্ছে, দশ ফুট উঁচু থেকে ডাইভ্ দিচ্ছে; সমুদ্রের স্রোতে ষাট ফুট পর্যন্ত সাঁতার দিয়ে চলে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা সব দেখে শুনে বলছেন. এই বানরেরা তাদের বিবর্তনের একটা নতুন বড় মোড়ে এসে পোঁছেছে; বলা যায়. সভ্যতার দরজায় এসে পোঁছেছে। এইভাবে জ্ঞান ও বুদ্ধি বাড়াতে বাড়াতে তারা একদিন মানুষের আরো কাছাকাছি চলে আসবে।

এর পরে তাহলে কী হবে? এই বানরদের কি লেজ খসে যাবে, তারা সোজা হয়ে দুপায়ে চলাফেরা করবে, তারপর পুরো মানুষ হয়ে যাবে, কথাবার্তা বলবে, ইস্কুলে যাবে, পড়া না পারলে কান ধরে বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে, তারপর চাকরি করবে, ডাক্তার হবে, উকিল হবে? মানুষের সমাজের সঙ্গে মিশে যাবে? সত্যি কথা হলো, তা কিন্তু হবে না। কারণ মানুষ আর বানরের মধ্যে থাকবে কয়েক লক্ষ বৎসরের বিবর্তনের ব্যবধান। এই সব বানরেরা হয়তো আরেক ধরনের উন্নত বুদ্ধির জীব হবে. হয়তো বহুকাল পরে বুদ্ধির দৌড়ে তারা মানুষের কাছাকাছি পোঁছাবে. কিন্তু কখনো মানুষ হবে না।

ছবি এঁকেছেন ॥ মদন সরকার

ম্যাজিকের মত / পার্থসারথি চক্রবর্তী

তোমরা সকলেই জান জলকে ফোটাতে হলে একশো ডিগ্রি সেণ্টি-গ্রেড তাপমাত্রা প্রয়োজন। তুমি যখন ইচ্ছে তাপ দিয়ে যে কোনও পাত্রের জল ফোটাতে পার।

কিন্তু যদি তুমি হঠাৎ বলে বস, আমি গরম তো করবই না, উপরন্তু ঠাণ্ডা করে জল ফোটাব, তাহলে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে, তাই না?—হ্যাঁ, ঠাণ্ডা অবস্থায় জল ফুটতে দেখলে সবাই শুধু অবাকই হবে না, সেই সাথে মজাও পাবে খুব। ম্যাজিকের মত এই ভোজবাজিটা দেখাতে হলে আমাদের চাই, একটা গোল কাঁচের ফ্লাস্ক, ক্ল্যাম্প আর রিং-স্ট্যান্ড। ফ্লাস্কটা পাইরেক্স কাঁচের তৈরি হলে ফেটে যাবার ভয় থাকবে না।

ফ্লাস্কটার অর্ধেক জল দিয়ে ভর্তি করে নিয়ে তাকে হিটার অথবা স্টোভের সাহায্যে গরম কর। জল ফুটতে আরম্ভ করলে ওটাকে বাইরে এনে তার মুখে ভাল করে একটা রবারের ছিপি আটকে দাও।

এইবার রিং-স্ট্যান্ডের সাথে ক্ল্যাম্প দিয়ে ফ্লাস্কের মুখ উপুড় করে আটকে রাখ এবং জল ফোটা বন্ধ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা কর। এখন কিছু ফুটন্ত জল ফ্লাস্কের উপর ঢাললেও তার ভেতরের জল ফুটবে না। কিন্তু এবার যদি তুমি ঠাণ্ডা বরফ জল ঢাল তাহলে এক অবাক করা কাণ্ড হবে—সাথে সাথে ফ্লাস্কের ভেতরের জল ফুটতে আরম্ভ করবে। ফুটন্ত জল যে কাজ করতে পারেনি, বরফ জল কী করে তা করল ভেবে সবাই খুব অবাক হয়ে যাবে। ফ্লাস্কের জল টগবগ করে ফুটছে অথচ পাত্রটা খুব বেশি গরম নয়—এর কারণ কী বলো তো?

আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে, তুমি যখন ঠাণ্ডা বরফ জল ঢালছ তখন পাত্রের ভেতরের বাষ্প জমে জল হয়ে যাচ্ছে। প্রথমবার জল ফোটার সময় ফ্লাস্কের ভেতরের সমস্ত বায়ু বেরিয়ে গিয়েছিল, তাই এখন ঐ জলের ওপর চাপ খুব কম। আর চাপ কম হবার ফলে জল কম তাপে ফুটতে থাকে। যদিও ঐ ফুটন্ত জল গরম নয়।

রাজায় রাজায়

কি করে দাবা খেলতে হয়

যার সাদা ঘুঁটি সে প্রথম চালে। একটা খেলা হওয়ার পর প্রথম খেলায় যার সাদা ঘুঁটি ছিল তাকে কালো ঘুঁটি নিতে হয়। তারপর তাকে সাদা ঘুঁটি নিতে হয়, আবার কালো, এই-ভাবে খেলা চলে।

সাদার প্রথম চাল হওয়ায় তার কিছু সুবিধে থাকে। অর্থাৎ তার খেলার উপরই প্রতিপক্ষের চাল নির্ভর করে। সেজন্যই একবার সাদা নিয়ে তারপর কালো নিয়ে খেলতে হয়, তাহলে সুবিধে-অসুবিধে ভাগা-ভাগি হয়ে যায়।

সাধারণত রাজার ঘরের বা মন্ত্রীর ঘরের বোড়েটিকে সামনে দু ঘর ঠেলে দিয়ে খেলা শুরু করা হয়।

দাবার ছকটির প্রত্যেকটি ঘরের আলাদা নাম দেওয়া রয়েছে। সেজন্য একটা খেলা পুরো কীভাবে খেলা হয়েছে তা লিখে রাখা চলে। কয়েকশো বছর আগেকার লোকেরা দাবা কীভাবে খেলতেন, লিখে রাখার ফলে আমরা তা আজও জানতে পারি।

রাজার ঘর এবং মন্ত্রীর ঘর মনে রাখা খুবই সহজ। যদি বলা হয় রাজার সামনের বোড়েকে সামনের দিকে দু ঘর এগিয়ে দেওয়া হল, তাহলে বোঝা কঠিন হয় না। আরো সহজে এটা বলা যায়, যেমন রাজার বোড়েকে রাজার উপরের চতুর্থ ঘরে চাল দেওয়া হল। রাজার বোড়েকে সংক্ষেপে রা-বো লেখা যায়। তাহলে প্রথম চালে সাদা যদি রাজার সামনের বোড়েকে রাজার উপরের চতুর্থ ঘরে চাল দেয় তাহলে এভাবে লেখা যায়ঃ

১। রা-বো—রা ৪।

'এর উত্তরে কালো যদি মন্ত্রীর সামনের বোড়েকে রাজার উপরের তৃতীয় ঘরে চাল দেয় তাহলে লেখা হবে ঃ

১। ...ম-বো—ম ৩।

রাজা এবং মন্ত্রী একটা করে থাকায় এটা লিখতে বিশেষ অসুবিধে হয় না, কিন্তু বোড়ে তো আটটা, নৌকো, ঘোড়া, গজ এরা তো সব দুটো করে। এদের কী করে চেনা যাবে? এদের চিনবার সুবিধের জন্য বলা হয় রাজার দিকের নৌকো, রাজার দিকের ঘোড়া, রাজার দিকের গজ, বা মন্ত্রীর দিকের নৌকো, মন্ত্রীর দিকের ঘোড়া এবং মন্ত্রীর দিকের গজ।

রাজার সামনের বোড়েকে বলা হয় রাজার ঘরের বোড়ে, মন্ত্রীর সামনের বোড়েকে বলা হয় মন্ত্রীর ঘরের বোড়ে। এছাড়া রাজার দিকের গজের উপরের বোড়েকে বলা হয় রাজার গজের বোড়ে। মন্ত্রীর দিকের গজের উপরের বোড়েকে বলা হয় মন্ত্রীর গজের বোড়ে। তেমনি রাজার দিকের নৌকোর বোড়েকে বলা হয় রাজার নৌকোর বোড়ে। সাদা এবং কালো—দু দিক থেকেই হিসেব করা হয়।

এগুলি অবশ্যই সংক্ষেপে লেখা যায়। যেমন, রাজার দিকের গজের বোড়েকে রা-গ-বো এভাবে লেখা যায়। হঠাৎ পড়লে মনে হবে, রাগবো! দাবায় কিন্তু রাগলে ভাল খেলা হয় না।

মন্ত্রীর দিকের গজের উপরের বোড়েকে বলা হয় ম-গ-বো।

রাজার ঘরের সাদা বোড়ে যদি মন্ত্রীর ঘরের কালো বোড়েকে মেরে দেয় তাহলে লেখা হবে ঃ রাবো×মবো, কিংবা সাদা রাজার দিকের নৌকো যদি কালোর মন্ত্রীকে মেরে দেয় তাহলে লেখা হবে, রানৌ×ম।

খেলার সময় অনেকেই নিজেদের এবং প্রতিপক্ষের চালগুলি লিখে রাখেন, তাহলে পরে নিজেদের খেলার ভুলগুলো দেখে নেওয়া যায় এবং

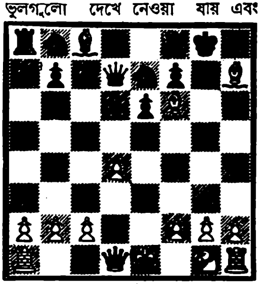

সাদার ৯ নম্বর চাল দেবার পরের অবস্থা। এখন কালো রাজাকে সাদা গজকে মারতেই হবে। তারপর সাদা মন্ত্রী নৌকোর ৫ম ঘরে গিয়ে কিস্তি দেবে।

তাতে খেলার উন্নতি হওয়ার সম্ভাবনা। বড় ছোট সব খেলোয়াড়েরই এটা শিখে নেওয়া উচিত, এবং খেলার সময় এটা মেনে চলা উচিত।

এবারে পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট একটা খেলা এখানে লিখে দিলাম, দাবা সাজিয়ে দেখ তো এটা বুঝতে পারো কিনা?

	সাদা	কালো
১।	বো—রাগবো৪	বো—রা৪
২।	বো—রাঘো৪	ম—নৌ৫ কিস্তি এবং মাত।

পৃথিবীর এটাই সবচেয়ে ছোট খেলা। অবশ্য, সাদার দ্বিতীয় চালটি যে মারাত্মক ভুল চাল তাতে আর সন্দেহ কী। সেজন্য চাল দেওয়ার সময় একটু বিবেচনা করে চাল দিতে হয়।

এবার দেখা যাক আরো একটা ছোট্ট খেলা ঃ

	সাদা	কালো
১।	বো—রা৪	বো—রা৩
২।	বো—ম৪	বো—ম৪
৩।	ঘো—মগ৩	বো×বো
৪।	ঘো×বো	গ—ম৩?
৫।	গ—ম৩	ঘো—রা২?
৬।	গ—ঘো৫	O—O
৭।	ঘো—গ৬ কিস্তি!!	বো×ঘো
৮।	গ×বো	ম—ম২
৯।	গ×বো কিস্তি!!	পরাজয় স্বীকার

পরাজয় স্বীকার, কেননা রাজাকে এবার বাধ্য হয়ে গজকে মারতে হবে। রাজা গজ মারলেই মন্ত্রী নৌকোর ৫ম ঘরে এসে কিস্তি দেবে। রাজাকে ঘোড়ার ঘরে যেতে হবে, এবং তখন মন্ত্রী নৌকোর ৮ম ঘরে বসলেই কিস্তি মাত!

উপরে যে খেলাটি লিখে দেওয়া হল, তাতে ৪ এবং ৫ নম্বরে কালোর চালে '?' চিহ্ন দেওয়া আছে, তার মানে হল—এটা ভুল চাল। আর আশ্চর্য-বোধক চিহ্ন '!' দেওয়ার অর্থ খুব ভাল চাল। O—O মানে হল রাজার দিকে কাস্‌ল করা। (এই সঙ্গে বলি, মন্ত্রীর দিকে কাস্‌ল করলে লেখা হয় O-O-O)

ম্যাজিক • জাদুকর পি. সি. সরকার জুনিয়র

আফ্রিকা মানেই রোমাঞ্চকর ঘটনার দেশ। নানারকম ঘটনা-দুর্ঘটনা যেন শুধু আফ্রিকাতেই জট পাকিয়ে আছে। ছোটবেলা থেকে অনেক বই-এ পড়েছি, তাছাড়া বাবার কাছেও নানারকম রোমাঞ্চকর ঘটনার কথা শুনেছি—সেজন্য আফ্রিকায় যাবার ইচ্ছে আমার বরাবরই ছিল। এবার যখন আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে আমায় ইন্দ্রজাল দেখাতে হলো, তখন মনে হচ্ছিল ছোটবেলার সেই কল্পনাগুলো যেন হঠাৎ ম্যাজিকের মতোই সত্যি ঘটনায় দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। অনেক মজার মজার ঘটনা ঘটেছে এবার।

আফ্রিকার জনসাধারণ ম্যাজিক জিনিসটাকে ভীষণ ভয় পায়। আমার নাম এ'রা দিয়েছেন "বাওয়ানা মুচাবি" অর্থাৎ "মিঃ জাদুকর"। নানারকম কুসংস্কারকে ভিত্তি করে এবং স্থানীয় জংলী ওঝাদের কথা শুনে এদের ধারণা হয়েছে যে, আমি একজন ভয়ঙ্কর মানুষ। 'ফুস্ মন্তর' করে দিয়েই আমি নাকি ওদের বোবা এবং অন্ধ করে দিতে পারি। আমি নাকি একদল গণ্ডাকে মন্ত্রের জোরে ছাগল বানিয়ে রেখেছি। তাছাড়া দেখতে কম বয়স হলেও আসলে আমি একজন বৃদ্ধ। আমিই নাকি আমার বাবা বা তাঁরও কোনো পূর্বপুরুষ, মন্ত্রবলে জওয়ান হয়ে আছি।

টানজানিয়ার আরুসা শহরে তখন পুরো দমে ইন্দ্রজাল চলছে। একদিন সকালে দেখি বাংলোর বাইরে একজন স্থানীয় অধিবাসী হাঁটু গেড়ে বসে হাউ হাউ করে কাঁদছে আর কী যেন বলছে। কাছে যেতেই সে মাটিতে আছড়ে পড়লো। জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কী?'

ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে সে যা বললো তাতে বুঝলাম—তাদের গ্রামে তার ছেলে মোবিতিকে আটকে রাখা হয়েছে—কারণ সে নাকি ভীষণ বোকা, কুঁড়ে এবং তাদের সমাজের কলঙ্ক। সে নাকি কাজের অযোগ্য এবং সব সময়েই কুঁড়ের মতো লেখাপড়া করে। গ্রামের ওঝা বলেছেন, লেখাপড়া করলে মাথা বিগড়ে যায়—আর সমাজের বাকি সবাইকে সম্মান করে না। সুতরাং গুরুজনদের সম্মান হানি হবার আগেই তাকে পরিশুদ্ধ করতে হবে। না হলে গ্রাম থেকে বের করে দেওয়া হবে।

মোবিতির বয়স চব্বিশ-পঁচিশ। জাতে মাসাই এবং কাজে মোরান বা যোদ্ধা। ওর খুব শখ লেখাপড়া শিখে শহরে এসে গাড়ি চালায়। ওর এক বন্ধু নাকি কেনিয়ার নাইরোবি শহরে থাকে এবং কোম্পানিতে ড্রাইভারের কাজ করছে বেশ কয়েক বছর হলো। ও সম্প্রতি সেখান থেকে ঘুরে এসেছে। কোম্পানির মালিক বলেছেন, এ-বি-সি-ডি ভালভাবে লিখতে শিখলে এবং নাম সই করতে পারলে তিনি মোবিতিকেও একটা চাকরি দেবেন। কিন্তু গ্রামের ওঝার মতে, লেখা-পড়া শেখা খুব খারাপ। লেখা-পড়া করলে মানুষ ভগবানের প্রদত্ত ক্ষমতাগুলো হারিয়ে ফেলে। সে আর শিকারে যায় না; খাবার দাবার পাল্টে ফেলে আর শুধু তা নয়, অসুখ হোক বা না হোক, শহরে গিয়ে সাদা-চামড়া ডাক্তারকে দিয়ে ছুঁচ ফুটিয়ে আসে—ওঝাকে সম্মানই করে না—ইত্যাদি। সুতরাং সমাজে আবার স্থান পেতে গেলে তাকে প্রায়শ্চিত্ত করতেই হবে। আজ সন্ধ্যেবেলায় আগুনের ছ্যাঁকা দিয়ে মোবিতিকে পরিশুদ্ধ করা হবে। হাজার কান্নাকাটিতেও ওঝার মন ভেজেনি। মোবিতি যদি আগুনের ছ্যাঁকা হজম করতে পারে—তাহলে বুঝতে পারা যাবে সে এখনও ভাল আছে—লেখাপড়ার কুনজর এখনও তার ওপর ভালভাবে পড়েনি।

লোকটা নিজে মনে প্রাণে ওঝাকে মানে। কিন্তু ছেলের সমূহ বিপদের জন্য খুবই কষ্ট পাচ্ছে। সে জানে আগুনের ছ্যাঁকায় ছেলে অসুস্থ হবেই। আর সেজন্যই সে আমার কাছে এসেছে। তার বক্তব্য আমাকে এমন একটা ওষুধ বাতলে দিতে হবে—যাতে আগুনেও কোনও ক্ষতি না হয়। আমার মাথায় চট্ করে একটা বুদ্ধি এলো। আমি এক শিশি ভর্তি তেল তার হাতে দিয়ে বললাম—এই তেলের কিছুটা তোমার ছেলের হাতের পাতায় ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিও। দেখবে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে, ওঝা সন্তুষ্ট হবে—কিন্তু তোমার ছেলের কোনও ক্ষতি হবে না। তার চোখ মুখ দেখে মনে হলো—ব্যাপারটা সে ঠিক বিশ্বাস করছে না। আমি তখন সেই তেল কিছুটা তার হাতে ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে দিলাম। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো সেটা—একটু পরে নিভেও গেল। সে তো ভয়ে হিম। কিন্তু তার হাতে কিস্যু হয়নি দেখে প্রচণ্ড অবাক এবং খুশীও। আমাকে বহুবার 'অসান্তে সায়ানা' অর্থাৎ ধন্যবাদ জানিয়ে শিশি নিয়ে চলে গেল।

তোমরা নিশ্চয় ভাবছ—এটা অসম্ভব। তেলে আগুন ধরলে তো হাত পুড়ে যাবে, তাই নয় কি? আসলে ঐ তেল জিনিসটা কোনও সাধারণ তেল ছিল না। ওটা ছিল এক বিশেষ মিক্সচার। জাদুকর হিসেবে সব কিছুর জন্যই আমাকে প্রস্তুত থাকতে হয়। ঐ মিক্সচার আমি সব সময়েই কিছুটা সঙ্গে রাখি—যদি কখনও প্রয়োজন হয় সে কথা ভেবে। বিজ্ঞানের স্যারকে জিজ্ঞেস করে তোমরাও এই মিক্সচার তৈরি করে দেখতে পারো—কেমন ম্যাজিকের মতো কাজ করছে। এটা তৈরি করতে গেলে চাই কিছুটা কার্বন-ডাইসালফাইড এবং কার্বন টেট্রা-ক্লোরাইড। যে কোনও কেমিস্ট-এর দোকানে অথবা ল্যাবরেটরিতে এগুলো পাওয়া যাবে। চার চামচ কার্বন টেট্রাক্লোরাইডের সাথে ছ চামচ কার্বন ডাইসালফাইড মেশালেই ব্যাস মিক্সচার তৈরি হয়ে গেল। এবার এই মিক্সচার হাতের পাতায় ঢেলে একটু আগুন দিলেই দপ্ করে জ্বলে উঠবে—হাতে মোটেই গরম লাগবে না। কিন্তু আগুন এমন দাউ দাউ করে জ্বলবে যে সবার সাথে তোমরাও অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু আবার বলছি, বিজ্ঞানের শিক্ষককে জিজ্ঞেস না-করে ও তাঁর অনুমতি না-নিয়ে এই খেলা দেখানো ঠিক নয়। কেননা, এর ফলে অন্য-কিছুতে আগুন লেগে বিপদ ঘটতে পারে।

আফ্রিকার এই আগুনের ম্যাজিকের কথা চাপা ছিল না। 'বাওয়ানা মুচাবি' মোবিতিকে আগুনের ছ্যাঁকার হাত থেকে বাঁচিয়েছে—একথা অনেকেরই জানা হয়ে গেল। একবার তো সেই গ্রামের ওঝা এসে হাজির। এসেছিল—আগুনের ঐ ঘটনা শুনে—আমায় জব্দ করতে। সে আবার আর-এক ঘটনা। সেটা পরে বলবো।

স্ট্রাইকার

ফুটবলের রঙ্গরাজ থঙ্গরাজ

গোলকীপারের হাবভাবটাই যেন রঙ্গময়। গোলকী-পার পিটার থঙ্গরাজ সেদিক থেকে সত্যিই রঙ্গরাজ।

এবারের লীগ মরশুম তখন থমকে রয়েছে। সারা ময়দান জুড়ে গ্যালারি-মেরামতির খট্-খটাস্ আওয়াজ। এই সময়ে ইস্টবেঙ্গল মাঠে থঙ্গরাজ। হঠাৎ ওঁকে দেখে চোখ কচলানোর অবস্থা। সত্যিই সওয়া ছ' ফুটের থঙ্গরাজ তাঁর চল্লিশ ইঞ্চি ছাতি না ফুলিয়ে আমার সামনে হাজির। একশো সাতাশি কেজির বপু একটুও টসকায়নি। এখনো আদুর-গা হলে গায়ে আঙুল ছোঁয়াতে হাত নিসপিস করে।

চার বছর হল থঙ্গরাজ কলকাতার মাঠে নেই। এখন তাঁর আস্তানা গোয়ার ভাস্কো ডা গামায়। স্পোর্টস অফিসারের চাকরি। শরীরটাকে তিনি মন্দিরের মত শ্রদ্ধা করেন। বয়স সবে চল্লিশ পেরিয়েছে। নিজেকে ফিট্ রাখতে এখনো সেই এক রুটিন। ভোরে ওঠা. নিবিড় অনুশীলন আর খাওয়া-দাওয়ায় নিক্তিমাপা নজর। গোয়ার ফুটবল মরশুমে থঙ্গরাজ ভাস্কো স্পোর্টসের গোলের গুহা আগলান—এতে চমকাবার কী আছে? থঙ্গরাজ প্রায় সিকি শতক ধরে প্রথম শ্রেণীর ফুটবল মাঠ আলো করে আছেন। এত দীর্ঘ সময় ধরে ভারতের ফুটবল-মাঠে কোন ফুটবলার এমনভাবে সাড়া জাগাতে পারেন নি।

থঙ্গরাজ সার্থক রঙ্গরাজ। অন্তত ফুটবলের দিক থেকে তো বটেই। থাকেন কোন্ সুদূর গোয়ায়, অথচ রোজ আঁতিপাতি করে খবর রাখেন কলকাতার ময়দানের। কলকাতা তাঁর চোখে ফুটবল-পাগলের শহর। এবারে প্রথম ডিভিশন লীগে ময়দানের তুঙ্গ পাগলামি মহমেডান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ দেখার জন্যই তাঁর কলকাতায় আসা।

এবারও তিনি উঠেছিলেন কলকাতায় তাঁর পুরনো ডেরা দক্ষিণ কলকাতায় কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনের এক বাঙালী বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুর বাড়ির সকলেই প্রায় মোহনবাগান-অন্ত প্রাণ। থঙ্গরাজ ইস্টবেঙ্গলে যখন খেলেছেন, তখন ইস্টবেঙ্গল মোহনবাগানকে হারালে তিনি হাতে মিষ্টি নিয়ে বন্ধুর বাড়ি ঢুকতেন।

মাস কয়েক আগে গোয়ার পানাজিতে এক ফুটবল-টুর্নামেন্ট হয়েছিল। কলকাতার এরিয়ান ক্লাবও ওখানে যোগ দেয়। থঙ্গরাজকে স্থানীয় ফুটবল-অনুরাগীরা ভাল টিম ও বেস্ট প্লেয়ারের নাম করতে বলে। তার সঙ্গে এও বলে, থঙ্গরাজ, তুমি তো কলকাতার প্লেয়ার ছাড়া নিশ্চয়ই আর কাউকে ভাল বলবে না। থঙ্গরাজ এ টিটকারি সহ্য করতে পারেননি। জোর গলায় বলেন, 'আমার অপরাধ কোথায়? ভারতে যা কিছু সত্যিকারের ফুটবল খেলা হয় তা কলকাতার ময়দানেই।'

গত ষাটের দশক জুড়ে থঙ্গরাজ কলকাতার ময়দানে ফুটবল-অনুরাগীদের মন ভরিয়েছেন। তিন বড় দল মহমেডান, মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গেই তাঁর সব আত্মীয়তা। তিনটে টিমেই তিনি খেলেছেন। সুতরাং খটকা লাগে, এত বড় প্লেয়ারের এত ক্লাব-ছাড়াছাড়ি কেন? থঙ্গরাজ জানালেন, 'কোন লোভের ফাঁদে পড়ে আমি এ-কাজ করিনি। তিনটে ক্লাবের হরেক পরিবেশ, সমর্থক, কর্মকর্তা—সর্বকিছু জানতে-বুঝতে আমি ক্লাব পাল্টেছি। এতে দুঃখ-আনন্দ দুই ঘটনাই ছড়িয়ে আছে।

গোলকীপারের কাজটাই তো হাসি-কান্নায় ভরপুর। যে-কোন ম্যাচে বারবার গোলকীপার অবধারিত গোল বাঁচাক, দর্শকেরা আহ্লাদে ফেটে পড়বে, তারিফ জানাবে, সাবাশ্। পর-মুহূর্তে সেই গোলকীপার সামান্য একটু ভুলচুক করে গোল খেলেই সেই আহ্লাদী দর্শকরা চোখ মটকায়। ম্যাচের শেষে তার দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না।

দীর্ঘ পঁচিশ বছর ম্যাচের পর ম্যাচে থঙ্গরাজ ওই সব ঘটনায় ভ্রূক্ষেপ না করে গোলের গুহা আগলিয়েছেন। পুরস্কারও প্রচুর মিলেছে। কোয়াড্রাঙ্গুলার, ওলিম্পিক, অথবা এশিয়াডে ভারতীয় গোলের দিকে নজর পড়তেই প্রতিপক্ষ ফরোয়ার্ডরা আঁতকে উঠেছে—ওই দাঁড়িয়ে, পিটার থঙ্গরাজ। দেশের মধ্যে যে-কোন নামজাদা টুর্নামেন্টে থঙ্গরাজ সেনাবাহিনী, রেলওয়েজ এবং বাংলার গোলের ঘাঁটি পাহারা দিয়েছেন। ফুটবল-দর্শক তাঁকে তুলনা করেছে দুই গোল পোস্টের মাঝে দাঁড়ানো টাওয়ার অথবা টাইটান নাম দিয়ে। এশিয়ান টিমের গোল পাহারা দিতেও থঙ্গরাজের ডাক এসেছে। কতবার ভারতের জার্সি পরেছেন, সে-হিসেব থঙ্গরাজের নিজেরই মনে নেই।

মাঠ-আলো-করে-থাকা থঙ্গরাজের চেহারাটা গোলের দুর্গ বাঁচানোর কাজে অঢেল সাহায্য করেছে। থঙ্গরাজের খেলার সঙ্গে নাকি রাশিয়ান গোলকীপার লেভ ইয়াসিনের আদবকায়দার মত মিল। ইয়াসিনকে থঙ্গরাজ প্রথম দেখেন ১৯৫৬ সালে, মেলবোর্ন ওলিম্পিকে।

ছোট বড় যে খেলাই হোক, থঙ্গরাজের মাঠে চলা-ফেরায় যেন রাজা-রাজা ভাব। মাঠে ঢুকেই এক খাবলা মাটি তুলে কপালে ছোঁয়ান। মন্ত্রমুগ্ধের মত তাঁর টিমের অন্যান্যরাও তাঁকে নকল করেছেন। পলকের মধ্যে আর-এক আচরণ, কিছুক্ষণ ধরে থঙ্গরাজ দুই গোল পোস্টের সামনে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে কী যেন বকেন। এ যেন মাটি আর পোস্টরূপী দেবতার কাছে তাঁর প্রার্থনা—সুস্থভাবে খেলায় যেন তিনি উতরে যান। খেলা শুরু হতেই দেখা গেছে, গোটা টিমের যত ঝক্কি যেন থঙ্গরাজের কাঁধে। তাঁর দাঁড়ানোর এমনি কায়দা, যেন দুর্ভেদ্য জিব্রাল্টার পাহাড়। হয়তো তাঁর টিমের রক্ষণভাগে কোন চিড় ধরেছে, থঙ্গরাজ উপযুক্ত সেনাপতির মত সতীর্থদের হুঁশিয়ার করে দিয়েছেন। তিন-ব্যাকের খেলা, কিন্তু থঙ্গরাজ তাঁর ব্যাক লাইনকে এমনভাবে সাহায্য করেছেন, যেন তিনি চতুর্থ ব্যাক। তাঁর গোল-কিক অথবা বল-ছোঁড়া—সবই মাপা। হয়তো তাঁর টিমের সব ঠেকা দেওয়ার চেষ্টা ব্যর্থ, প্রতিপক্ষের মুখের সামনে শুধু থঙ্গরাজ, তাঁকে ফাঁকি দিতে পারলেই গোল। থঙ্গরাজ তাঁর বিশাল দেহটি নিয়ে পথ এমনি আগলেছেন যে, সেই গোলমুখো একরোখা ফরোয়ার্ড নিমেষেই পোষা-মেনি। গোলকীপারকে যে-কোন ফুটবল টিমের হার-জিতের শেষ খুঁটি বলা হয়। থঙ্গরাজ তাঁর খেলার ভিতর দিয়ে জানিয়েছেন, তিনি তাঁর টিমের আক্রমণেরও মূল সলতে হতে পারেন।

ভাল গোলকীপার কীভাবে হওয়া যায়? থঙ্গরাজের বক্তব্য, ভাল গোলকীপারকে সব পজিশনে নিজেকে মানিয়ে খেলতে জানতে হবে। গোল আগলানোর মর্মটা তবেই ভালরকম টের পাওয়া যায়। থঙ্গরাজ সব পজিশনেই খেলতে রাজি। ফুটবল-মাঠে তিনি শুরু করেছিলেন সেণ্টার ফরোয়ার্ড হিসাবে।

থঙ্গরাজ স্বপ্ন দেখেছেন, ইয়াসিনের মত গোলকীপার হবেন। মেক্সিকান গোলকীপার কার্বাজেলের মত দীর্ঘদিন ধরে গোলকীপারের দায়িত্বে থাকবেন। দ্বিতীয় স্বপ্নটা অনেক-পরিমাণেই সফল। তাঁর বড় আক্ষেপ, 'ইয়াসিনের মত হতে পারলাম না। হবই বা কী করে! ইয়াসিনের মত খেলতে হলে গোলকীপার হওয়ার ধ্যানে ডুবে যেতে হয়। সেটাই গোলকীপার হওয়ার নেশায় বুঁদ হয়ে যাওয়া। দরকার হলে রাস্তায় বেড়ানোর সময়েও গোলকীপারের অনুশীলনের কাজগুলো নিঃসাড়ে করে যাওয়ার স্বাধীনতা চাই। এ-দেশে তা নেহাতই অসম্ভব। লোকে বলবে—আরে দেখ, দেখ, থঙ্গরাজ পাগল হয়ে গেছে!'

পঞ্চাশ ও ষাটের দশক জুড়ে থঙ্গরাজ ভারতীয় ফুটবল গোলকীপারদের মধ্যে এক জ্বলজ্বলে জ্যোতিষ্ক। কথাটা আরও ভাল করে ভাবলে একটি সত্যি প্রসঙ্গ যেন হাত-তুলে দাঁড়িয়ে ওঠে। ভারতীয় দলের গোলের চৌকিদারি করতে করতে বারবার খুব কাছাকাছি থেকে তিনি দেখেছেন, টিমে কোন্ প্লেয়ার ভাল, কোন্ প্লেয়ার মাটো। তাঁর পছন্দসই সেরা ভারতীয় একাদশটি যে-কোন ফুটবল-বুঝদারের কাছে চাঁদের ধুলোর মত দামী।

চার ব্যাক নয়, তিন ব্যাকই থঙ্গরাজের পছন্দ। ডান দিক থেকে তাঁর ব্যাক লাইনে দাঁড়াবেন লতিফ, আমেদ হোসেন ও রহমান। রাইট ব্যাক লতিফের খেলা থঙ্গরাজের চোখে যেন লেগে আছে! বড় ঠাণ্ডা মগজের প্লেয়ার এই লতিফ। থঙ্গরাজের চোখে তিনি যৎকিঞ্চিৎ নার্ভাসও। তাঁর এই ধড়ফড়ানি টিমের যত ভাল মন্দ নিয়ে। এমন কী এ জন্যে মাঠে তিনি চিৎকারও পেড়েছেন অনবরত ব্যক্তিগত সহানুভূতির জন্যে। থঙ্গরাজের বেশ মনে আছে সেই ১৯৫৯-এ জাকর্তার প্রি-ওলিম্পিকসে ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে খেলাটি। পায়ে চোট লাগায় থঙ্গরাজ সে ম্যাচ খেলতে পারেননি, প্র্যাকটিসের পরে থঙ্গরাজ তাঁর পায়ের চোট নিয়ে জেরবার হয়ে পড়েন। লতিফ কিন্তু সব কাজ ভুলে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন।

তিন-ব্যাকের খেলায় সেণ্টার অথবা স্টপারের কাজটায় থঙ্গরাজের মনে জার্নালের চেয়েও বেশী আঁচড় কেটেছেন আমেদ হোসেন। জার্নালের খেলায় যতটা লম্ফঝম্ফ ছিল, হোসেনের খেলায় তা ছিল না। জার্নালের খেলায় গা-জোয়ারি ছিল বেশী, আমেদ হোসেন সেক্ষেত্রে অবস্থাটাকে ম্যানেজ করতেন নিঃশব্দে রীতিমত বুদ্ধি খরচ করে। জার্নাল প্রচণ্ড খেটে খেললেও নিজের খেলায় মাঝে মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলতেন। আমেদ হোসেন সেক্ষেত্রে যে-কোনো পরিস্থিতির সামাল দিতেন নিজের উপর অগাধ ভরসায়। পর্বতকায় থঙ্গরাজ অকপটে স্বীকার করলেন, আমেদ হোসেনের পিছনে গোলকীপার খেলতে খেলতে মনে হত যেন পর্বতের আড়ালে আছি।

লেফট ব্যাক হিসাবে টি এ রহমানের নামটা যেন থঙ্গরাজের ঠোঁটে ঝুলেছিল। তিনি বললেন, এরকম উদার ফুটবলার আমি দুটো দেখিনি। যেমনি উচিত সময়ে উচিত কাজটি করেছে, তেমনি সজাগ থেকেছে টিমের ফাটল কী করে মেরামত করা যায়। খেলতে খেলতে তার মুখে সদাই একটা কথা লেগে থাকত—কুছ পরোয়া নেহি। বছর এগারো আগের ঘটনা, সেবার আমি মোহনবাগানে। ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে খেলার আগে পায়ের পেশীতে টান ধরায় তেমন বুকে বল পাচ্ছিলাম না—ভাবছিলাম খেলব কি খেলব না। রহমান কথায় কথায় আমায় এমন তাতিয়ে তুলেছিল যে, খেলার সময় পায়ের ব্যথা কোথায় যেন পালিয়ে গেল।

লিঙ্কম্যান-কাম দুই হাফের জায়গাটিতে থঙ্গরাজ দাঁড় করালেন কেম্পিয়া ও মহম্মদ নুরকে। কেম্পিয়া থঙ্গরাজের বিচারে দুর্দান্ত খাটিয়ে ফুটবলার। ফরোয়ার্ড লাইনকে কী ভাবে খেলাতে হয়, সে-কৌশল ছিল তাঁর বুটের ডগায়। প্রতিপক্ষের গোলের দিকে কী-ভাবে আক্রমণ ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায়, তাও কেম্পিয়া চমৎকার জানতেন। খেলার সময় কেম্পিয়া চোট পেয়েও কুঁকড়ে যেতেন না। এর্নাকুলামে সেটা ছিল সন্তোষ ট্রফির খেলা-বাংলা ও মহীশূরের মধ্যে। খেলার মধ্যেই কেম-পিয়া মাথায় এমন আঘাত পান যে, পাঁচটা সেলাই করতে হল। মাথা রক্তে ভেসে যাচ্ছে, তবু কেম্পিয়া শেষ অবধি খেলা চালিয়ে গেছেন।

থঙ্গরাজের পছন্দসই লেফট হাফ অন্ধ্রের মহম্মদ নুরও ছিলেন ধীর মেজাজের গুণী ফুটবলার। থঙ্গরাজ নিজে বড় সহজ ভঙ্গিতে খেলার পক্ষপাতী। বেশী তিড়িং-বিড়িং করে লোক-দেখানো খেলায় তাঁর বিশ্বাস নেই। নুরও খেলতেন সহজ ভঙ্গিতে, থ্রো-ইনের অমন অনায়াস ভঙ্গি আর কারও মধ্যে দেখা যায়নি। মাঝে মাঝে আচমকা তিনি নিজের ফরোয়ার্ডলাইনের সঙ্গে বেড়ে গিয়ে গোল করে আসতেন। পি কের মত রাইট-আউটকে কায়দা করার ক্ষমতা কিছুটা নুরেরই ছিল।

থঙ্গরাজ এক নিশ্বাসে পাঁচটি ফরোয়ার্ডের নাম বল-লেন, 'পি-কে, ইউসুফ, কেষ্ট পাল, চুনি এবং বলরাম।' দুজনকে আলাদা করে রাখলেন—ইউসুফ আর কেষ্ট পাল। 'পি-কে, চুনি আর বলরামের খেলা নিয়ে কী আর বলব! ওরা তো সেরা ফুটবলার। ভারতের মাঠে ও'দের দ্বিতীয় সংস্করণ আর পাওয়া যাবে না।' কথাগুলো বলার সময় শ্রদ্ধায় থঙ্গরাজ প্রায় চোখের পাতা বন্ধ করে ফেলেছিলেন।

অন্ধ্রের ইউসুফ সম্বন্ধে থঙ্গরাজের ব্যাখ্যা, 'গোল-ছাড়া ও তো সব পজিশনেরই সমান গুণী প্লেয়ার। এমন খাটিয়ে এবং দ্রুত গতির ফরোয়ার্ড খুব কমই চোখে পড়ে। নিজের এত খেলার গুণ, কিন্তু কখনো তাকে বড়াই করতে শুনিনি।'

সেণ্টার ফরোয়ার্ডে নেভিল ডি-সুজা ছেড়ে কেষ্ট পাল কেন? এরকম তর্ক উঠবেই, থঙ্গরাজ তা জানেন। তবু তাঁর বিশেষ পছন্দ কেষ্ট পালকে। বারবার হেডে গোল পাওয়া কেষ্ট পালকে থঙ্গরাজ বাড়তি সম্মান দেন। গোল করার তাগিদে তাঁর অনবদ্য সুলুক-সন্ধানী খেলা থঙ্গরাজকে বিশেষভাবে নাড়া দিয়েছে।

দশ জনের নাম হয়েছে। পছন্দ মাফিক টিমটি তৈরি করতে করতে থঙ্গরাজ কিন্ত গোড়ার কাজটিতে ভুল করেননি। মাঝে শুধু বাড়তি কথাটি বললেন, 'আমার ফুটবলের কথা লেখার সময় বাড়ির গল্প না ফাঁদাই ভাল। ওটা বিশেষ জগৎ।' হেলেন, শীলা ও অরুণ—দুই মেয়ে ও এক ছেলে। তাঁর স্ত্রী স্কুল-শিক্ষিকা। থঙ্গ-রাজ অনধ্রের ছেলে। প্রশ্ন করলাম, 'গোলকীপারের পজিশনে কাকে দাঁড় করাবেন?'

সে-সময় পিটার থঙ্গরাজকে মনে হল পিটার দি গ্রেট অথবা রাজা থঙ্গরাজরূপে। জানালেন, 'আমার মনের মত গোলকীপার—সনৎ শেঠ। ১৯৫৬ মেলবোর্ন ওলি-ম্পিকে ওকে ফেলে আমাকে আর নারায়ণকে কেন নিয়ে-গিয়েছিল তা আজও বুঝতে পারি না।' ভাবলাম এই কথাটা কি মনুমেণ্টের উপরে দাঁড়িয়ে ঘটা করে প্রচার করা যায় না?

বেসবলের দেশে ফুটবলের রাজা

এখনো টং‌টাং করে কথাগুলো বাজে। বছর তিনেক আগের কথা। ব্রাজিলে পেলেকে নিয়ে দারুণ টানাটানি। হাজারবার সাধাসাধি চলেছে। ম্যানিখের ওয়ার্ল্ড কাপ ফুটবলে ব্রাজিল টিমে পেলে খেলবে কি খেলবে না। ম্যানিখে ব্রাজিল তেমন সুবিধা করতে পারেনি। সকলেরই এক কথা। টিমে পেলে ছিল না, তাই ভাল খেলেনি।

পেলেকে এ জন্যে দুষবে, এমন বুকের পাটা কারো নেই। মোটামুটি ধরেই নেওয়া হয়, এত ধরাধরিতেও পেলে যখন গরজ দেখাচ্ছে না, তখন নিশ্চয়ই সে ফুটবল-মাঠ থেকে চিরতরে সরে দাঁড়াল। সকলকে চোখের জলে ভাসিয়ে পেলে তার প্রিয় স্যানটোস ক্লাবের জার্সিও খুলে ফেলল। মাস কয়েক আগের ঘটনা। এতে সবাই নিশ্চিত হয়েছে, এবার সত্যিই পেলে মাঠের-মায়া কাটিয়ে উঠতে পেরেছে। এবার সে ঘরকুনো হবে, পেলে নিজেও এ-কথা ঢাক পিটিয়ে সবাইকে জানিয়েছেন। কথাটার সঙ্গে একটা 'কিন্তু'র লেজুড় অবশ্য থেকে গেছে। তিনি বলেছেন, পৃথিবীর যেখানে হোক, ফুটবলের প্রসারকল্পে তিনি খেলতে নামবেনই।

মনে পড়ে কি পেলের স্যানটোস টিমের ১৯৬৮-র নিউইয়র্ক সফর? সেখানে বেসবল আর আমেরিকান ফুটবল নিয়েই দর্শক-দের যত মাথা খোঁড়াখুঁড়ি। সকার (যা আমাদের দেশে ফুটবল হিসাবে জনপ্রিয়) গেমকে তেমন কেউ পাত্তা দেয় না। অথচ ওই বছরে পেলের স্যানটোস টিম সেখানে নামতেই রাতারাতি সবাই সকার গেমের ভীষণ বুঝদার হয়ে ওঠে। গোটা হইচইটা কিন্তু পেলেকে কেন্দ্র করে। ওখানকার সাংবাদিকরা ভবিষ্যদ্বাণী করে ফেলেছে, পেলে যদি এখানে খেলে, তবে সকার গেমের উন্নতি হু-হু করে হবেই।

সাত বছর আগের সেই ঘটনারই যেন পুনরাবৃত্তি ঘটল গত মে মাসের মাঝামাঝি থেকে জুনের দশ তারিখ পর্যন্ত। পেলেকে নিয়ে দারুণ দর-কষাকষি। নর্থ আমেরিকান সকার লীগের ক্লাব নিউইয়র্ক কসমস টিমের কর্তাদের দারুণ টানাপোড়েন গেল। লোভনীয় প্রস্তাব—অফিস বাড়ি, মোটর গাড়ি, বেড়ানোর জন্যে শৌখিন নৌকো আর তার সঙ্গে ৪৫ লক্ষ আমেরিকান ডলার।

তার মানে প্রায় সাড়ে তিন কোটি টাকা। তিন বছরের চুক্তি। পেলেকে নিয়ে কসমস ক্লাবের এই ঔৎসুক্যে প্রথম দিকে কেউ তেমন গা করেনি। ভেবেছে, নিউইয়র্ক সিটির সকার-জগতে কসমস এমন আর কী করতে পারে। এ তাদের নিছকই প্রচার-ভড়ক।

কসমস সম্পর্কে এ-রকম বদ্-ধারণার ঘোর অল্পদিনেই উবে যায়। ক্রমাগত পেলের খেলার খবর নিয়ে খবরের কাগজগুলোও হঠাৎ আগ্রহী হয়ে ওঠে। পেলের সই-সাবুদের দিনে নিউইয়র্ক সিটির সাংবাদিকরা হুমড়ি খেয়ে ভিড় করেছে। ব্যাপারটা বেশ জমজমাট হল, পেলে যেদিন প্রথম খেলতে নামল। র‍্যান্ডেল আইল্যাণ্ডের ডাউনিং স্টেডিয়ামে দর্শক উপচে পড়ছে। ম্যাডিসন অ্যাভেন্যু দিয়ে পেলের স্টেডিয়ামে ঢোকার রাস্তা। ওদিকে সী স্টেডিয়ামে বেসবলের আসর জমজমাট। তবু পেলেকে দেখতে ম্যাডিসন অ্যাভেন্যুতে দারুণ জ্যাম। সবাই তাজ্জব, বেসবলের মত প্রাণের খেলা থাকতে এখানে এত ভিড়!

পেলে মাঠে ঢুকতেই দর্শককুল টগবগিয়ে উঠেছে। খেলা শুরু, পেলে যেন নতুন পাড়ায় এসেছে, পরিস্থিতি বুঝে নিতে চায়। এদিকে কসমসের প্রতিপক্ষ ডালাস টর্নাডো পেলেকে আমলে আনল না। অক্লেশে কসমসের গোলে দু-বার বল ঢুকিয়েছে। ইতিমধ্যে পেলেও তেতে গনগনে। ডালাসের গোলে কসমসের আক্রমণ আছড়ে পড়ছে। সব আক্রমণেই পেলে নেতৃত্ব দিচ্ছে। সাতটি কর্নার পেল কসমস, কিন্তু কাজ হল না কিছুই।

হাফ-টাইমের পরে কসমস তাদের আক্রমণের তোড়ে আরও জোয়ার এনেছে। ডালাস আর কত রুখবে, পেলের মাপা পাস থেকে স্পিগলার গোল করেছে। কানফাটা চিৎকার উঠল পেলে হেড করে খেলা ২—২ গোলে দাঁড় করাতেই। গোলের পিছনে ক্যামেরাম্যানরাও কাজ ফেলে তাণ্ডব নৃত্য শুরু করেছে। খেলা যখন শেষ হল, ধরা পড়ল পেলের জার্সির পিঠ ছেঁড়া। সবই আদর আতিশয্যের দরুন।

পেলেকে নিয়ে ম্যাচের পর ম্যাচ এত আদিখ্যেতা দেখানোয় সকারের নিন্দুক-মহল প্রচার করে, পেলে যে ম্যাচে খেলে না, সে ম্যাচে তো বড় একটা ভিড় দেখি না। অন্য দিকেও অঢেল যুক্তি রয়েছে। পেলের খেলা দেখতে কমবয়সী ছোকরারা যে রকম ভিড় করেছে, তাতে প্রতিক্রিয়াটা নির্ঘাৎ ভালর দিকে মোড় নেবে। বেসবল ও আমেরিকান ফুটবল ছেড়ে তারা হয়তো পেলের সকার গেমের দিকেই ঝুঁকবে। টেলিভিশন কোম্পানিও পেলের ফুটবলের কারচুপি জনগণকে জানাতে উঠে পড়ে লেগেছে। ব্রাজিলের পেলে এতদিন আমেরিকান যুবকদের মনে রূপকথার রাজপুত্র ছিল। সে যখন তাদের উঠোনেই ফুটবলের কলাকৌশল দেখাচ্ছে, তখন তার ফল পরিণতি খারাপ হবে না।

এদিকে পেলেকে নিয়ে তার দেশেও দারুণ হৈ-চৈ। এতদিন 'না না' করে শেষে ভিনদেশে গিয়ে তুমি খেলছ—রাগটা ঠিক এই রকমের। পেলের অনুরাগীরা ঘটনাটা ধামাচাপা দিয়ে বলছে ফুটবলের প্রসার ও উন্নতির জন্যেই পেলে এ-কাজ করছে, তার কোন দোষ নেই। আর সমালোচকরা বলছে—পেলে অবসর নেওয়ার পর থেকে তার ব্যবসায় মন্দা চলছিল, তাই সে টাকার জন্য নিউইয়র্ক ছুটেছে। তাদের বক্তব্য, "পেলে আমাদের কাছে এখনো 'রাজা' ও ঈশ্বরের সামিল। তার সব দোষ মাপ করব, যদি সে ১৯৭৮ ওয়ার্ল্ড কাপে ব্রাজিল টিমে খেলার সম্মতি দেয়।"

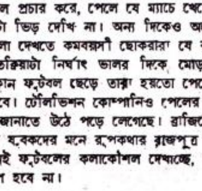

বাপ কা বেটা

পঙ্কজ রায় আবার খেলবেন। এবারের ময়দানে ক্রিকেটের এটাই জবর খবর। স্পোর্টিং ইউনিয়ন টিমে তাঁকে দুলতে দুলতে আবার ইনিংস ওপেন করতে যেতে দেখা যাবে।

কেন খেলবেন? বেশ কয়েক বছর তো উনি খেলেননি! ব্যস্ত ছিলেন টেস্ট টিম বাছাই নিয়ে, শরীরটাও আগের মত তেমন গাট্টাগোট্টা নেই, বয়সটাও ভারী—৪৭। তবু খেলবেন!

বছর দুয়েক হল 'ফুচা' নামের ক্রিকেটারটি ময়দানে আদর পাচ্ছে। আদর করে অনেকেই ডাকে—মিনি পঙ্কজ রায়। অবিকল সেই পঙ্কজ, একমাত্র সফল বাঙালী টেস্ট ক্রিকেটার।

'ফুচা' পঙ্কজবাবুর মেজছেলে। পোশাকী নাম—প্রণব রায়। বয়স—১৭। বাপের আদল ওই পেয়েছে। স্কুল ক্রিকেটের হরেক টুর্নামেন্টে ফুচা সেঞ্চুরির তুবড়ি ছুটিয়ে বাপের নাম রেখেছে। এরই মধ্যে ডাবল সেঞ্চুরি করেছে (২৫১) বিহারের স্কুল টিমের বিরুদ্ধে। চান্স দিয়েছিল দুটি। এত বড় ইনিংস গড়ার সময় আদৌ সে হাঁকপাক করেনি। পঞ্চাশ রান করার নজর নিয়ে মন দিয়ে খেলে গেছে সারা ইনিংস।

স্কুলের বড় খেলায় ফুচার আরও তিনটে শ'রের ইনিংস আছে। ছেলের মনে যাতে গুমর না হয়, সেজন্য পঙ্কজবাবু বলেন, "ফুচা তুই বড় ক্রিকেটার হওয়ার একশো ধাপের মাত্র এক ধাপ পেরিয়েছিস।" ফুচার ক্রিকেটের যা কিছু অ-আ-ক-খ, তা শিখিয়েছেন কার্তিক বসু। সারা ভারত জুড়ে নওজোয়ান ক্রিকেটারদের মধ্যে ফুচাও একজন। বাঙ্গালোরের পঁচিশ জনের এক অনুশীলন শিবিরে সম্প্রতি সে ডাক পেয়েছিল। দেড় মাসের সেই কোচিং ক্যাম্পের ট্রায়াল ম্যাচে একমাত্র ফুচাই সেঞ্চুরি করেছে। হেমু অধিকারী ওই ক্যাম্পের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। পিঠ চাপড়ে দিয়েছেন ফুচার, "তুমি খাটো, তোমার হবে।"

ক্যাম্প থেকে ফিরে ফুচার বোধোদয় হয়েছে—টপ্ ফিটনেস ছাড়া ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ফুচার কাছে বড় হওয়া মানে বাপের ধাঁচে কিছু করা। পাঁচ বছরের মধ্যে সে সুযোগ আসতে পারে—এটা ফুচার ক্যালকুলেশন। পঙ্কজবাবু সেই জন্যেই ছেলের সঙ্গে জুড়ি বেঁধে খেলতে নামবেন।

আরে, একটা বোতল! কে জানে হুইস্কির বোতল কিনা...
হুঁ হুঁ বাবা, যা ভেবেছি, তাই!
মরতে যখন হবেই, তখন বোতলটা সাবাড় করেই মরা যাক...
অ্যাই, তুমি অনেকক্ষণ এটাকে চালিয়েছ... এবারে আমি চালাব!
থামো, এখন মশকরার সময় নয়...
কী, আমাকে চালাতে দেবে না?
ছাড়ো! ছাড়ো!
উঃ, টালটা খুব জোর সামলে নিয়েছি...
পিছনে তাকাও!
আমার সঙ্গে চালাকি? দাঁড়াও, মজা দেখাচ্ছি!
ইনজিনের শব্দে কিছু শুনতে পাচ্ছে না!
চালাতে দেবে কি না? এক...দুই...তিন...
একটু স্থির হয়ে বোসো তো!
এই তোমার অবাধ্যতার শাস্তি...

এর পর পঞ্চাশের পাতায়

বিষাণধারী রোল্যাণ্ড

উমা দাশগুপ্ত

অনেক দিন আগে ফরাসী দেশে শার্লেমান বলে এক রাজা ছিলেন। পরাক্রান্ত রাজা, ন্যায় বিচারের জন্যও বিখ্যাত। এমন রাজাদের সম্পর্কে যে সব গল্প তোমরা অনেক সময় শুনে থাকো, সে সব গল্প শার্লেমানের নামেও চলিত ছিল। তিনি আশ্চর্য সব যুদ্ধে জয়ী হয়েছিলেন। তিনি আবার ধর্মভীরু খৃষ্টানও ছিলেন। ফরাসীদেশের মানুষ তাদের রাজাকে নিয়ে যে সব গল্প বলতো বা লিখতো তার মধ্যে একটি গল্প খুবই বিখ্যাত হয়ে পড়েছিল। এই গল্পটি ক্রমে ক্রমে সারা ইউরোপে ছড়ায়। এবং আজ আমরা সবাই এই গল্পটি ভালবাসি।

গল্পের নায়ক রোল্যাণ্ড। সে ছিল শার্লেমানের সেনাপতি এবং রূপকথার সেনাপতির মতনই পরম সুন্দর এক যুবক। তাঁর হাতে থাকতো এক জাদু বিষাণ বা শিঙা। সেই বিষাণটির আশ্চর্য গুণ ছিল এই যে, রোল্যাণ্ড নিজে যখন সেটি বাজাতেন, তার আওয়াজ বহুদূর পর্যন্ত শোনা যেত। এই বিষাণটি ছাড়া রোল্যাণ্ডের ছিল একটি ম্যাজিক তলোয়ার। কিন্তু মৃত্যু যখন রোল্যাণ্ডের কাছে এল তখন ঐ জাদুমন্ত্রের বিষাণ, ঐ তলোয়ার কিছুই রোল্যাণ্ডকে বাঁচাতে পারেনি। রূপকথার জগতে আকাশের দেবতাদের কাছে শুধু রোল্যাণ্ড অমর হয়ে রইলেন। এই বিষাণধারী রোল্যাণ্ডকে তোমরা ইতিহাসেও খুঁজে পাবে। তবে রূপকথার মধ্যে সে অনেক বেশী জমকালো।

রোল্যাণ্ডের মৃত্যুর পিছনে এক ভয়াবহ বিশ্বাসঘাতকতার গল্প রয়েছে। রোল্যাণ্ড ছিলেন গ্যানেলনের সৎপুত্র এবং গ্যানেলন ছিলেন শার্লেমানের একজন অত্যন্ত কাপুরুষ সহচর। সে সময় স্পেনে মুসলমানদের রাজত্ব ছিল। তখনকার ইউরোপে মুসলমানদের স্যারাসেন বলা হত। শার্লেমানের সঙ্গে স্যারাসেনদের লড়াই চলছিল প্রচণ্ড। বলা বাহুল্য স্যারাসেনরা খুবই অসুবিধায় পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত তারা সন্ধির প্রস্তাব পাঠায়। রোল্যাণ্ডের মত ছিল, সন্ধি না হওয়াই ভাল। আর একান্তই যদি সন্ধি করতে হয় তাহলে তাঁর পিতা গ্যানেলনই এই কাজের জন্য একমাত্র উপযুক্ত মানুষ। কথাটা গ্যানেলনের একেবারেই ভাল লাগেনি। স্যারাসেনদের বিশ্বাস কী? সন্ধি প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে যদি শখের প্রাণটা যায়? এ সব দুশ্চিন্তা সত্ত্বেও তাঁকে যেতেই হল। প্রতিশোধ হিসেবে তাই গ্যানেলন শত্রুদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে রোল্যাণ্ডেরই সর্বনাশের ব্যবস্থা করলেন।

গ্যানেলন স্যারাসেনদের কাছ থেকে ফিরে এলেন। সকলে জানলো যে শান্তি এসেছে। শার্লেমান নিশ্চিন্ত হয়ে দেশের দিকে রওনা হলেন। রাজাকে বুঝিয়ে গ্যানেলন ব্যবস্থা করলেন তরুণ রোল্যাণ্ড যেন সব চেয়ে পিছনের সৈন্যদের দায়িত্ব নেন। শার্লেমানের বিশালবাহিনী এগোল, সব শেষে রোল্যাণ্ড এবং তাঁর বন্ধু

অলিভার। ফ্রান্স এবং স্পেনের মাঝখানে পীরেনিস্ পাহাড় পেরোতে গিয়ে রন্‌সিভালের কুখ্যাত উপত্যকায় রোল্যাণ্ড হঠাৎ লক্ষ্য করলেন চারদিকে স্যারাসেন সৈন্য। রাজা শার্লেমান ততক্ষণে মূল সেনাবাহিনী নিয়ে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছেন। রোল্যাণ্ড অবশ্য ভয় পাবার পাত্র ছিলেন না। সামান্য সৈন্য সঙ্গে নিয়েও তিনি যুদ্ধ করতে এগিয়ে গেলেন। অলিভার বন্ধুকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন। বললেন, বিষাণ বাজিয়ে শার্লেমানকে ডেকে আনতে। কিন্তু অলিভারের পরামর্শ রোল্যাণ্ড মানলেন না। রন্‌সিভালের যুদ্ধ শুরু হল। শত্রুদলের যথেষ্ট ক্ষতিও হল কিন্তু শেষ পর্যন্ত অল্প কিছু ফরাসী যোদ্ধা বাকি রইল। তাদের মৃত্যু নিশ্চিত। ফরাসীদেশের আর্চবিশপ টার্পিন তখন রোল্যাণ্ড আর অলিভারের সাহায্যে এগিয়ে এলেন। রোল্যাণ্ডকে তাঁর বিষাণ বাজাতে অনুরোধ করলেন বারবার, যাতে রাজা

ও'দের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে পারেন। শেষ পর্যন্ত রোল্যান্ড এমন জোরে সেই বিষাণ বাজালেন যে তাঁর কপাল ফেটে রক্ত ঝরে পড়ল। ৯০ মাইল দূরে শার্লেমানের শিবিরে সেই শব্দ পৌঁছল। শার্লেমান শতশত বিষাণ বাজিয়ে জানালেন তিনি আসছেন। সেই বিষাণের আওয়াজ কিন্তু রোল্যান্ডের কানে এলো না।

রনসিভালের যুদ্ধ চলতেই থাকল। আঘাতে জখম হয়ে অলিভার প্রায় অন্ধ হয়ে গেলেন এবং ভুলে রোল্যান্ডকেই আঘাত করে বসলেন। অবশ্য অলিভার নিজেই মারা গেলেন তাতে। এই দুর্ঘটনায় অস্থির হয়ে রোল্যান্ড শেষ বারের মত তাঁর বিষাণ বাজালেন। এবারে তাঁর বিষাণের শব্দটি খুব ক্ষীণ শোনাল। রোল্যান্ডের তখন প্রায় শেষ অবস্থা। ইতিমধ্যে শার্লেমানের সৈন্যদল কাছে এসে পড়েছে, রাজার বিষাণ শোনা গেল। সেই শুনে স্যারাসেন দল রোল্যান্ডকে হত্যা করবার শেষ চেষ্টা করে ব্যর্থ হল এবং পালাবার জন্য তৈরী হল। রোল্যান্ড কিন্তু তখনও যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে, তখন তাঁর একমাত্র চিন্তা তাঁর ম্যাজিক্ তলোয়ার দুরেনদাল কিছুতেই যেন শত্রুর হাতে না পড়ে। তলোয়ারটিকে পাথরে ঠুকে ভাঙ্গাতে লাগলেন। কিন্তু দুরেনদালের আঘাতে পাথর কেটে গেল, তলোয়ার অটুট রইল। রোল্যান্ডের শেষ প্রশ্ন, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর তলোয়ার, তাঁর বিষাণ কাকে দেবেন?

শার্লেমান যখন এসে পেঁছিলেন তখন সন্ধ্যা। কিন্তু দেবতারা সূর্যকে ধরে রাখলেন, তাই সব কিছুই স্পষ্ট। রাজা দেখলেন, রোল্যান্ড উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন, জীবন নেই। তাঁর বুকের নীচে সেই বিষাণ, সেই তলোয়ার! স্বর্গের পরীরা নেমে এসেছেন রোল্যান্ডকে রক্ষা করতে। যেমন, তোমরা জানো, রাজা আর্থারের জন্য তাঁরা এসেছিলেন। ক্ষিপ্ত শার্লেমান প্রচন্ড আক্রমণ চালিয়ে পলাতক স্যারাসেন সৈন্যদলকে নিঃশেষ করে দিলেন। এর পরে এল গ্যানেলনের শাস্তির পালা। গ্যানেলন ক্ষমা ভিক্ষা করলেন এই বলে যে তিনি রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়াননি। দাঁড়িয়েছিলেন তাঁর সৎপুত্র রোল্যান্ডের বিরুদ্ধে। রোল্যান্ড যে অন্যায় করেছিল তার শোধ তুলতে। কিন্তু রাজা তাঁর কর্তব্য ভুললেন না। শার্লেমানের ন্যায়ের রাজত্বে রোল্যান্ডের মৃত্যুর জন্য গ্যানেলনকেও মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হল। তাতে অবশ্য কারুর দুঃখ ঘুচলো না, বিশেষ করে অলিভারের বোন আউডের তো নয়ই। রোলান্ডের সঙ্গে তার বিয়ের সব ঠিকঠাক ছিল। শার্লেমানের মুখ থেকে সে যখন রোল্যান্ডের মৃত্যু সংবাদ পেল তখনই রাজার পায়ে সে প্রাণ দিল। সুতরাং রূপকথার পবিত্র জগতে সুন্দর রোল্যান্ড যতদিন বেঁচে ছিলেন ততদিন সুন্দর অনেক কিছু ঘটেছিল। তার পরেও কিন্তু রোল্যান্ডের প্রতি অদ্ভুত এক আকর্ষণ রয়েই গেল লোকের মনে। যার পরিচয় রয়েছে কবিতায় আর অল্প একটু ইতিহাসের পৃষ্ঠায়।

রনসিভালের যুদ্ধ ঐতিহাসিক ঘটনা। ৭৭৮ সনে এই যুদ্ধ হয় এবং এই যুদ্ধে তিনজন বিখ্যাত যোদ্ধা তাঁদের জীবন দেন। তাঁদেরই একজনের নাম ছিল রোল্যান্ড। ইতিহাস বলে এই যুদ্ধে স্যারাসেন সৈন্য ছিল না। পীরেনিস্-বাসী বাস্ক বলে এক পাহাড়ীজাতি শার্লেমানের সৈন্যদলের পিছন দিকে আকস্মিক আক্রমণ করে যথেষ্ট ক্ষতি করে। কিন্তু এই যুদ্ধ সম্পর্কে স্পষ্ট কোনো বর্ণনা ঐতিহাসিকদের জানা নেই। শার্লেমান অবশ্য বিশ্ববিখ্যাত রাজা ছিলেন। তাঁর রাজত্বে সত্যিই তিনি আইন ও শৃঙ্খলার ভাল ব্যবস্থা করেছিলেন। তখনকার ইউরোপ অন্ধকার-যুগের ইউরোপ, সেখানে সবরকম অত্যাচার চলত। এই অবস্থায় শার্লেমানই প্রথম নীতির ভিত্তিতে শাসন করেন। মনে হয় এই জন্যই এই রূপকথাটির সৃষ্টি। ইতিহাসের রোল্যান্ড খুবই অস্পষ্ট ব্যক্তি, তাঁর সম্পর্কে আমরা প্রায় কিছুই জানি না। কিন্তু এখানেই রূপকথা জেতে। এখনও ঐতিহাসিকেরা লক্ষ করেন যে ১১ শতকের ফরাসীদেশে অভিজাত পরিবারের লোকেরা প্রায়ই তাঁদের ছেলেদের নাম রাখতেন রোল্যান্ড না হয় অলিভার। বিশ্বাসঘাতক গ্যানেলনের নাম কেউ দিতেন না।

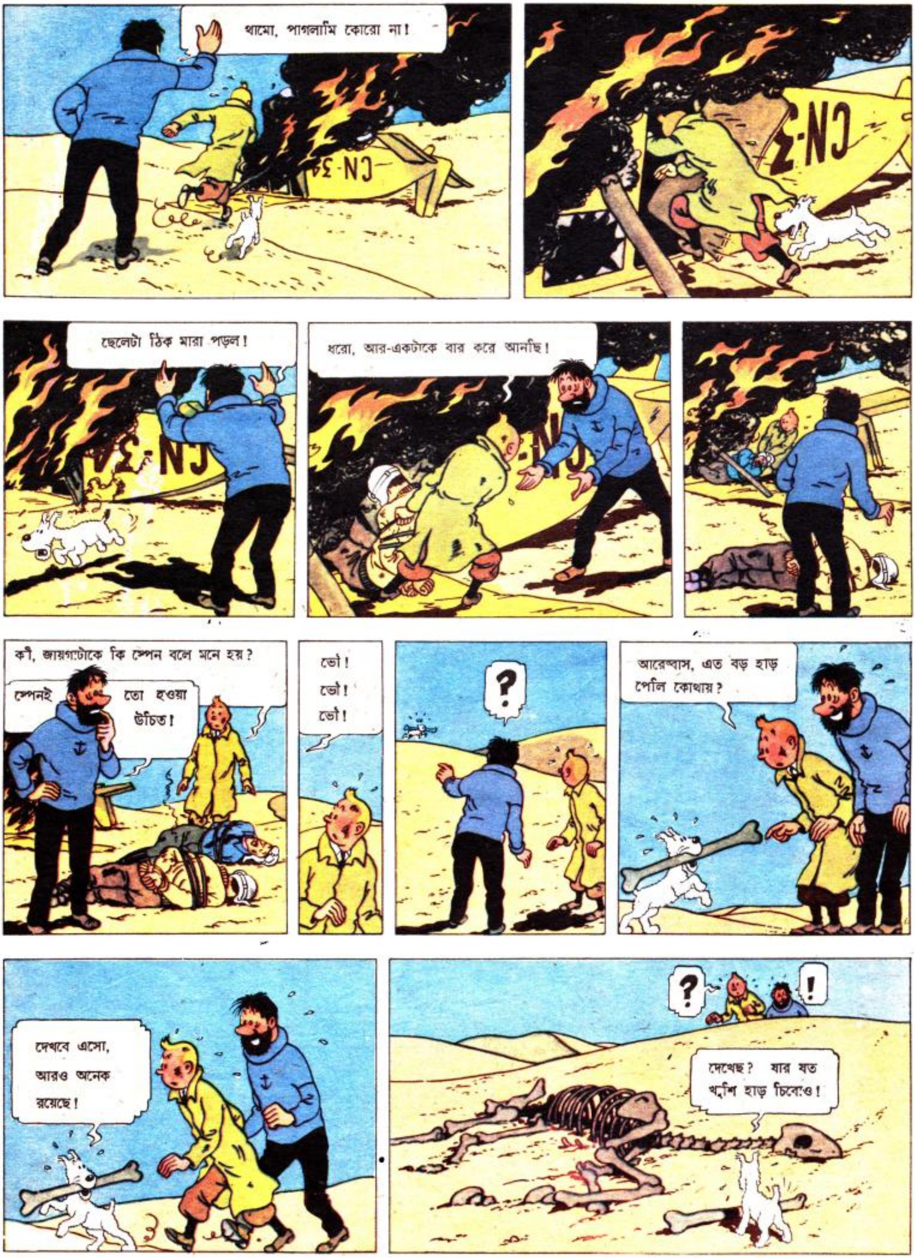
থামো, পাগলামি কোরো না!
ছেলেটা ঠিক মারা পড়ল!
ধরো, আর-একটাকে বার করে আনছি!
কী, জায়গাটাকে কি স্পেন বলে মনে হয়?
স্পেনই তো হওয়া উচিত!
ভৌ!
ভৌ!
ভৌ!
?
আরেব্বাস, এত বড় হাড় পেলি কোথায়?
দেখবে এসো, আরও অনেক রয়েছে!
?
!
দেখেছ? যার যত খুশি হাড় চিবোও!

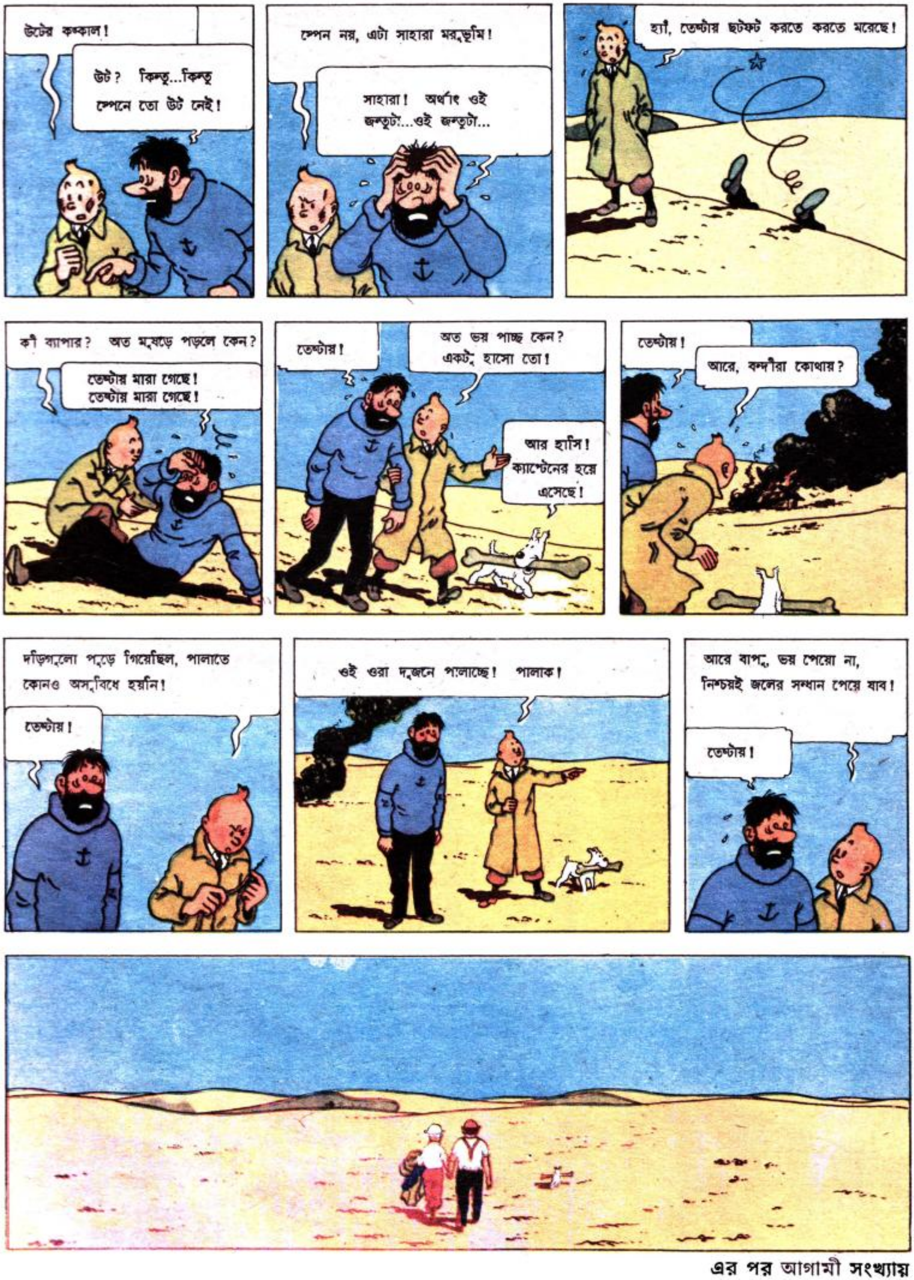

এর পর আগামী সংখ্যায়

আজব চিড়িয়াখানা

বজ্রকণ্ঠী

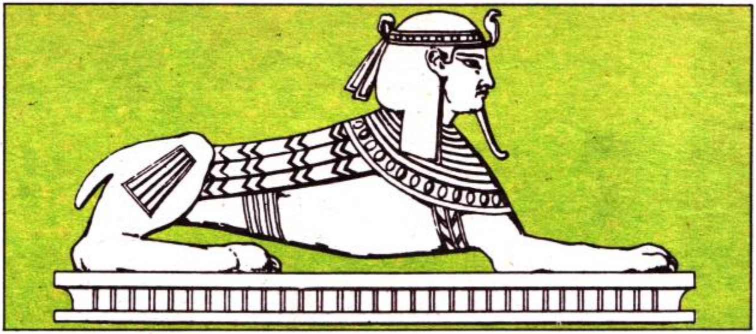

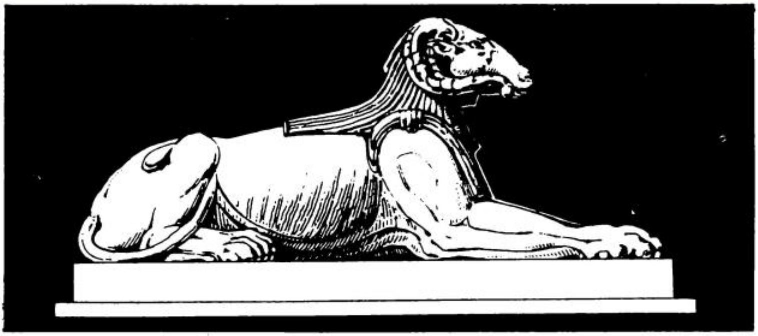

অবিকল মানুষের মতো মুখ। মাথায় সুন্দর মুকুট। শরীরটা কিন্তু ষণ্ড-মার্কা,—ষাঁড়ের মতো। অথচ পা-গুলো যেন সিংহের কাছ থেকে ধার করে আনা; থাবায় ধারালো নখ। এদিকে পিঠে পাখির মতো পাখনা।

এক সঙ্গে চার চারটি প্রাণী। যাকে বলে—একের ভেতরে চার। মানুষ, ষাঁড়, সিংহ আর ঈগল। চার মিলে এক, তাই বুঝি নামটাও একটু খটমট—স্ফিংক্স! মিশরের কথা উঠলেই পিরামিড আর এই স্ফিংকস-এর কথা। দুই-ই দেখবার মতো।

সব স্ফিংক্স অবশ্য দেখতে এক রকম নয়। চেহারায় রকমফের আছে। কারও মাথায় মানুষের বদলে হয়তো ভেড়া কিংবা পাখির মুণ্ডু। কারও পাখা নেই। কারও লেজ নাকি আবার সাপের মতো। তাছাড়া, শুধু মিশরে নয়, স্ফিংকস অন্য দেশেও আছে। ছিল। তবে দেখবার মতো স্ফিংকস বটে চার প্রাণী মিলে যে এক, সেটাই।

স্ফিংকস মাত্রই খুব জ্ঞানী আর বুদ্ধিমান। জ্ঞানীরা কথা বলেন কম। স্ফিংকসও হাজার হাজার বছর ধরে মৌন, একদম চুপচাপ। একমাত্র কথা বলতো গ্রীসের এক স্ফিংকস। সামনে দিয়ে যাবার উপায় নেই। গেলেই সে ধাঁধা জিজ্ঞেস করবে।

"আচ্ছা বল তো, কোন্ প্রাণী সকালে চার পায়ে হাঁটে, দুপুরে দুই পায়ে, আর সন্ধ্যায় তিন পায়ে?" উত্তর দিতে না পারলেই ধরে টপ করে গিলে ফেলতো সে বেচারা-মানুষদের। ওই রাক্ষুসে স্ফিংকস কত মানুষকে যে গিলে খেয়েছে তার হিসেব নেই। শেষে এক বুদ্ধিমান গ্রীক তরুণ বললেন, "হুঃ এই তোমার ধাঁধা? শোন, উত্তর বলে দিচ্ছি। আসলে তুমি মানুষদের কথাই বলছো? ছোটবেলায় আমরা হামা-গুড়ি দিয়ে চলি। আমাদের তখন চার পা যেন। বড় হলে আমরা দু-পায়ে হাঁটি। বুড়ো হলে চলি লাঠিতে ভর দিয়ে। আমাদের তখন তিন পা। নাও, হলো তো!"

কেউ যা পারে না, এই ছেলেটি সহজেই তা পেরে গেল! মনের দুঃখে স্ফিংকস বেদী থেকে ঝাঁপ দিল মাটিতে। সেই থেকে সেও নির্বাক, মুখে রা-টি নেই!

তবু স্ফিংক্স কিন্তু নিজেই এখনও ধাঁধা। মানুষ কোথা থেকে পেল এমন আজব প্রাণীর সন্ধান? কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন—স্ফিংকস আসলে আমাদের বাঁদর। ঐ দেশের লোকেরা শুনেছিল, বাঁদরের মুখটা অনেকটা মানুষের মতো, যদিও শরীরটা তার জন্তুর মতো। ও'রা সিংহ দেখেছেন, ভেড়া দেখেছেন, ষাঁড় দেখেছেন, কিন্তু নিজেদের চোখে তখনও বাঁদর দেখেন নি। সুতরাং, বাঁদর গড়তে গড়ে বসলেন স্ফিংকস! আবার অন্যরা বলেন, এসব ঠিক নয়। স্ফিংকস আসলে মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষের কল্পনা। মাথাটা তার মানুষের মতো। অর্থাৎ সে বুদ্ধিমান এবং জ্ঞানী। অথচ সিংহের মতো সাহস তার, ষাঁড়ের মতো শক্তি। আর গুটানো পাখা শান্ত নীরবতার প্রতীক।

অনিন্দিতা চক্রবর্তী (বয়স সাড়ে তিন বছর)

তোমাদের পাতা

রেলগাড়ির গান

কু ঝিক ঝিক, কু ঝিক ঝিক,
রেলগাড়ির পো।
আমায় ফেলে উড়োজাহাজ?
মোটর গাড়ি? ছোঃ॥
ভোঁ ভসভস, ভোঁ ভসভস,
ইঞ্জিনেতে ধোঁয়া।
এক মিনিটেই ছুটতে পারি,
এখান থেকে গোয়া॥
নিয়ে যাব পেরিয়ে পাহাড়,
পেরিয়ে সমুদ্দুর।
যেতে পারি তোমায় নিয়ে,
হোক না যতই দূর॥
আমি হচ্ছি আদ্দিকালের,
বদ্দি বুড়ির মত।
কোথায় লাগে আমার কাছে,
হালফ্যাসানী যত॥

ঈশিতা মিত্র
(বয়স ১১½)

মোগলদের বাবা ছেলে

যারা আর্টস পড়ে, তাদের মধ্যে অনেকেই শুধু বাবর আর হুমায়ুন কেন সমস্ত মোগল সম্রাটদের নিয়েই গোলমালে পড়ে যায়। মোগল-সাম্রাজ্যের পর পর সম্রাটদের নাম হয়ত অনেকের মনে থাকে না। তাই তোমাদের সুবিধার জন্য একটা সূত্র বলে দিচ্ছি। তোমাদের মধ্যে হয়ত অনেকেই জানো। যারা জানো না তারা জেনে নাও। সূত্রটা আমাদের মিডল স্কুলের স্যারের কাছ থেকে শেখা। এখন আমি হাই স্কুলে, তাও আবার সায়েন্স নিয়ে পড়ি। যাক্ সে কথা। সূত্রটা হল —'বাবার হল আবার জ্বর স্যারিল ঔষধে।' তোমরা অনেকে হয়ত ভাবছ এ আবার কি? ঘাবড়াবার কিছু নেই, বুঝিয়ে দিচ্ছি। এই বাক্যের প্রথম শব্দটা হল বাবার' এবং এই শব্দটার প্রথম অক্ষর হচ্ছে 'ব'। অতএব বুঝতে হবে 'ব' দিয়ে বাবর। ঠিক তেমনি 'হল'-র 'হ' দিয়ে হুমায়ুন। হুমায়ুন বাবরের ছেলে ছিলেন অর্থাৎ দ্বিতীয় সম্রাট। 'আবার' -এর 'আ' দিয়ে আকবর, 'জ্বর'-এর 'জ' দিয়ে জাহাঙ্গীর, 'স্যারিল'-এর স্যা দিয়ে 'সাজাহান' এবং 'ঔষধ'-এর 'ঔ' দিয়ে ঔরঙ্গজেব। এইভাবে বুঝলে।

বিধেন্দু দে
(বয়েস ১৪ বৎসর)

[redacted]

তোমাদের চিঠি

আনন্দমেলায় ধাঁধার পাতা আর কমিকস আমার সবচে প্রিয়। দাদুর কাছে নাম ওলটানো খেলা — তিনটে শিখেছিলাম যেমন নিধুরাম রাধুনী, রমাকান্ত কামার, ও সুবললাল বসু। অনেক চেষ্টা করে আরো চারটে নাম তৈরী করেছি যেমন দেবী দে, সদাই দাস, নারান রাণা আর লতাবেতাল। আরো নাম জানতে ইচ্ছে করে।

—অনিন্দিতা দত্ত, তৃতীয় শ্রেণী, ৮ বছর, সেণ্ট জনস ডায়োসেসন হাই স্কুল, কলকাতা ১৯।

প্রত্যেকটি সংখ্যা "আনন্দ মেলা" আমাদের মেলাই আনন্দ দিচ্ছে। কিন্তু জাদুকর পি সি সরকার জুনিয়ার-এর ম্যাজিকগুলো শিখে বন্ধুদের দেখিয়ে বাহাদুরি নেওয়াটা হচ্ছে না। যাকেই দেখাই বা দেখাতে যাই—তারা তো সবাই যে আনন্দমেলা পড়ে সব জেনে গেছে আগে-ভাগেই। এটা কিন্তু খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার! ঘরে ঘরে আনন্দমেলা স্থান পাচ্ছে, এটা অবশ্য জেনে আপনাদের ভাল লাগবে।

কল্লোল দে
(১০ বছর)

'আম পাতা জোড়া জোড়া
মারবো চাবুক চড়বো ঘোড়া,
ওরে বিবি সরে দাঁড়া
আসছে আমার পাগলা ঘোড়া।...'

কাছে ভিতে ঘোড়া নেই। হয়তো আস্তাবলে আছে। দেখলে মনে হয় সাহেব এই মাত্র ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমেছেন। নেমে একটু বিশ্রাম করছেন।—কী নাম ও'র? জানি না। তবে ক্লাইভ-হেস্টিংস নিশ্চয় নন। তাঁরা আমাদের চেনা। নামজাদাদের বিস্তর ছবি দেখা আছে। কিছু আসে যায় না। সন্দেহ নেই, ইনি একজন সাহেব বটেন।

সাহেবের সঙ্গে আমাদের দেখা ঠাকুরপুকুরে। বেহালা ছাড়িয়ে। সেখানে গুরুসদয় মিউজিয়ামের কুলুঙ্গিতে বসে ঝিমুচ্ছিলেন তিনি। বললাম, 'হ্যালো! গুড আফটারনুন!' সাহেব মুখ ঘুরিয়ে তাকালেন।—ব্যস! অমনি ক্লিক! ফটো তোলা হয়ে গেল।

কোথা থেকে এলেন এই সাহেব? কোথা থেকে আবার?—বিলেত থেকে। তোমরা নিশ্চয় জানো, সাহেবরা আমাদের দেশ দখল করে নিয়েছিল। চারদিকে তখন সাহেবের ছড়াছড়ি। অফিসে সাহেব, আদালতে সাহেব, পথে ঘাটে, হাটে মাঠে—সব জায়গায় সাহেব। সাহেব তখন কাপড়ের কলে, নীল তৈরির কারখানায়, চায়ের বাগানে,—কোথায় নয়? রাজার হালে থাকতেন তাঁরা। কারও কারও মেজাজ ছিল খুবই খারাপ। একজন বাঙালী কবি পদ্য লিখে নালিশ জানিয়েছিলেন ও'দের রানীর কাছে—ওমা বিক্টোরিয়া করগো মানা...। যত তোর রাঙা ছেলে আর যেন মা চোক রাঙে না।...

এ-সাহেব বদমেজাজী ছিলেন কিনা আমরা জানি না। দেখলে মনে হয় ভালোমানুষটি। তবে পোশাক পরিচ্ছদ দেখে মনে হয় প্রথম দিকে যেসব সাহেবরা এসেছিলেন ইনি তাঁদেরই কেউ। দেশের মানুষ নিশ্চয় সেদিন অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন এ'র মুখের দিকে। শুধু এ'র দিকে কেন, যেকোনও সাহেবই সেদিন দেখবার মতো। গাঁয়ের মানুষেরা দেখতেন, আর সুযোগ পেলেই দেখাতে বসতেন অন্যদের। সে-কারণেই বাংলাদেশের ঠাকুর দেবতার মন্দিরের গায়ে পোড়া মাটির সাহেব মেম, পটের ছবিতে সাহেব, নকশি কাঁথায় সাহেব; সাহেব এমনকি মা মাসীদের কাপড়ের পাড় আর আঁচলে পর্যন্ত! এ-সাহেব অবশ্য কাঠ দিয়ে গড়া। যাকে বলে—কাঠ খোদাই। বাংলাদেশে পাথর কম, তাই কারিগরদের কাছে মাটি আর কাঠেরই বেশি কদর। পোকায় কিছুটা খেয়ে নিয়েছে, তবু চিনতে কোনও অসুবিধা নেই। তবে এমনও হতে পারে, এ-সাহেব ঠিক আমাদের দেশের কারিগরদের হাতে গড়া নয়। হয়তো কোনও জলজ্যান্ত সাহেবের সঙ্গে জাহাজে চড়ে ভাসতে ভাসতে এসেছিলেন আমাদের দেশে। হয়তো আমাদেরই কেউ বিলেত থেকে শখ করে নিয়ে এসেছিলেন তাঁকে। তাতে কিছু আসে যায় না। এই কাঠের-সাহেবের বক্তব্য একটাই—একদিন ও'রা এসেছিলেন। সাহেবরা একদিন রাজত্ব করেছিলেন আমাদের দেশে।

—হ্যালো সাহেব, গুড বাই!

শ্রীপান্থ

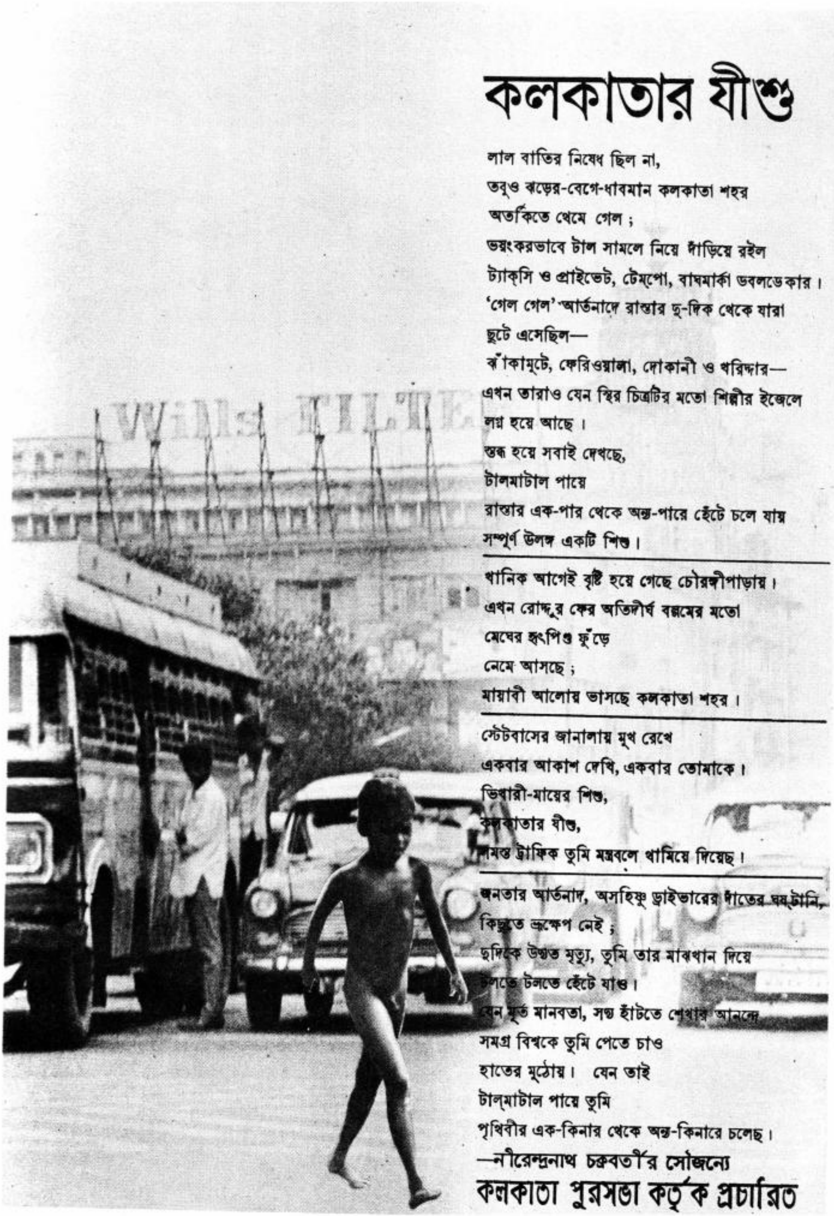
কলকাতার যীশু
লাল বাতির নিষেধ ছিল না,
তবুও ঝড়ের-বেগে-ধাবমান কলকাতা শহর
অতর্কিতে থেমে গেল ;
ভয়ংকরভাবে টাল সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল
ট্যাক্সি ও প্রাইভেট, টেমপো, বাঘমার্কা ডবলডেকার।
'গেল গেল' আর্তনাদে রাস্তার দু-দিক থেকে যারা
ছুটে এসেছিল—
ঝাঁকামুটে, ফেরিওয়ালা, দোকানী ও খরিদ্দার—
এখন তারাও যেন স্থির চিত্রটির মতো শিল্পীর ইজেলে
লগ্ন হয়ে আছে।
স্তব্ধ হয়ে সবাই দেখছে,
টালমাটাল পায়ে
রাস্তার এক-পার থেকে অন্ত-পারে হেঁটে চলে যায়
সম্পূর্ণ উলঙ্গ একটি শিশু।
খানিক আগেই বৃষ্টি হয়ে গেছে চৌরঙ্গীপাড়ায়।
এখন রোদ্দুর ফের অতিদীর্ঘ বল্লমের মতো
মেঘের হৃৎপিণ্ড ফুঁড়ে
নেমে আসছে ;
মায়াবী আলোয় ভাসছে কলকাতা শহর।
স্টেটবাসের জানালায় মুখ রেখে
একবার আকাশ দেখি, একবার তোমাকে।
ভিখারী-মায়ের শিশু,
কলকাতার যীশু,
সমস্ত ট্রাফিক তুমি মন্ত্রবলে থামিয়ে দিয়েছ।
জনতার আর্তনাদ, অসহিষ্ণু ড্রাইভারের দাঁতের ঘষ্‌টানি,
কিছুতে ভ্রূক্ষেপ নেই ;
দুদিকে উদ্যত মৃত্যু, তুমি তার মাঝখান দিয়ে
টলতে টলতে হেঁটে যাও।
যেন মূর্ত মানবতা, সদ্য হাঁটতে শেখার আনন্দে
সমগ্র বিশ্বকে তুমি পেতে চাও
হাতের মুঠোয়। যেন তাই
টাল্‌মাটাল পায়ে তুমি
পৃথিবীর এক-কিনার থেকে অন্ত-কিনারে চলেছ।
—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সৌজন্যে
কলকাতা পুরসভা কর্তৃক প্রচারিত

REGD. NO. WB/CC 264

ANANDAMELA

দেড় টাকা

আনন্দমেলা